নবপর্যায় : ২য় বর্ষ, ২য় সংখ্যা, জুলাই ২০২১

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর বার্তা

Young filmmakers, don't be afraid to challenge the dominate narratives & stereotypes of your times

-Catherine Masud

First of all I would like thank the organizers of Liberation DocFest Bangladesh, its a great honour to be with you & particularly I would like to thank Liberation War Museum, festival committee, filmmakers & of course the audiences who have made the online festival such a great success. I would like to take a moment to express my sadness for those we have lost during this terrible pandemic. I know the Liberation War Museum & the festival has also deeply felt the loss.

This is been a wonderful event, featuring films documenting, stories, people's movement, liberation struggle from all over the world. From Argentina to

Hong Kong, from Greenland to South Africa it's been a very Impressive line up. It's also been a occasion to highlight films under liberation war from past to present including "Muktir Gaan". As well as, new Bangladeshi voices who are bringing their youthful vision with country's struggle.

And for young filmmakers I would like to say few words also. You are part of cinematic story tellers, capturing struggles & times, the Liberation war & related themes. Don't be afraid to challenge the dominate narratives & stereotypes of your times. In our times, Tareq Masud & I tried to search out untold stories & fought against threats & sensorship to bring our creative vision to the screen. So to the young people of today, I say don't be afraid to search for the truth & find you own voice to tell it. There's a responsibility also that comes with the role of documentary storytellers. A responsibility to be truthful & ethical. Also a responsibility to breath & inspire. Let the documentaries you craft be like begins life to inspire you generation & the generation to come. Because we will never rise if we stand alone. We must stand together & help others come forward in order to build a better society.

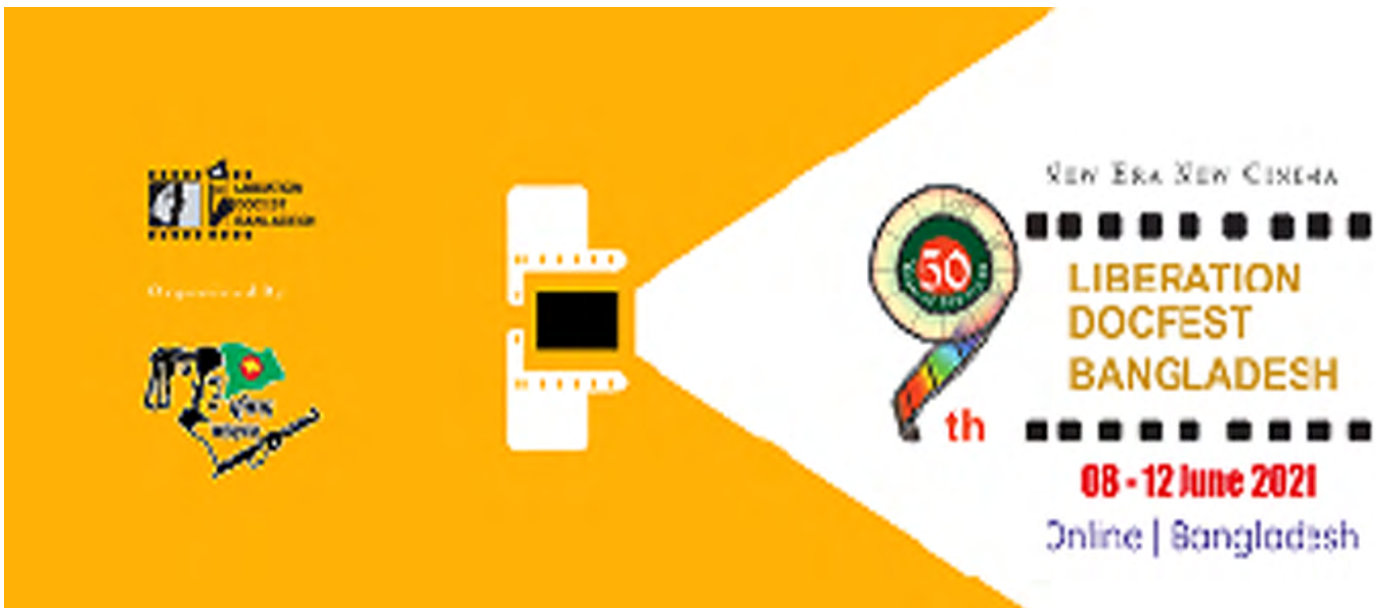

লিবারেশন ডকফেস্ট

সকলের ভালোবাসার চলচ্চিত্র উৎসব

শরিফুল ইসলাম (শাওন)

৯ম লিবারেশন ডকফেস্ট আমার তৃতীয় কাজ উৎসব প্রোগ্রামার হিসেবে। প্রতিবারই নতুন চ্যালেঞ্জ নতুন অভিজ্ঞতা হচ্ছে। সাধারণত চলচ্চিত্র উৎসব একটি প্রতিষ্ঠানের মুল প্রোগ্রাম হয়ে থাকে। সারাবছরব্যাপী প্রস্তুতি নেয় একটি বিশাল দল এবং তাদের সামষ্টিক কাজের প্রতিফলন ঘটে বাৎসরিক এই উৎসবে। লিবারেশন ডকফেস্ট বাংলাদেশ-এর আয়োজক প্রতিষ্ঠান মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর, বাংলাদেশের সবচেয়ে ক্রিয়াশীল প্রতিষ্ঠানগুলোর অন্যতম। তাই মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের অন্যান্য অনুষ্ঠানগুলোর সাথে সমন্বয় করেই লিবারেশন ডকফেস্ট বাংলাদেশ বেড়ে উঠছে। আজ এর সাফল্য দেশ ছাড়িয়ে বিদেশের মাঝেও ছড়িয়ে পড়েছে।

উৎসবের কাজ খানিকটা সিনেমা বানানোর মতোই। আমাদের তিনটি ধাপে কাজ করতে হয়- ফেস্টিভ্যালের আগে, ফেস্টিভ্যালের সময় এবং ফেস্টিভ্যালের পরে। তবে আমাদের মূল চ্যালেঞ্জটা ফেস্টিভ্যালের আগেই। কল ফর এন্ট্রি দেয়ার পর থেকে দেখতে হয় সবার কাছে যেন বার্তা পৌঁছায় যে ফেস্টিভ্যালে ছবি জমা নেওয়া হচ্ছে। খুঁজে বের করতে হয় ভালো সিনেমা প্রজেক্টগুলো কারা করছে, তাদের ছবিগুলো আমাদের উৎসবে আনা। কারা জুরি হবেন, স্পেশাল প্যাকেজে কোন কোন ছবি থাকবে, কী কী বিশেষ সেশন হবে, ওয়ার্কশপের মেন্টর কারা হবেন সব কিছুই ঠিক করে ফেলতে হয় ফেস্টিভ্যালের আগে।

এবারের ফেস্টিভালে ১০৬টি দেশের মোট ১৮৫৪টি চলচ্চিত্র জমা পড়ে। আমরা ১৬৪টি চলচ্চিত্র এবারের ফেস্টিভ্যালে দেখিয়েছি। এ জন্য১১৯টি চলচ্চিত্র বাছাই করতে হয়েছে ১৮৫৪ চলচ্চিত্র থেকে। আমরা দেখাতে পারিনি ১৭৩৫টি চলচ্চিত্র। প্রতিটি ছবির মূল্যায়ন যাতে সঠিক হয় সেটা নিশ্চিত করা আমাদের জন্য সবচেয়ে কঠিন কাজ ছিলো। একটি ছবি বাছাই করার জন্য তিন জনকে দেখানো হয়েছে। এই কঠিন কাজটি করেছেন বাংলাদেশের একঝাঁক তরুণ চলচ্চিত্র নির্মাতা ও একাডেমিকগণ। তাদের কাছে আমরা কৃতজ্ঞ তারা নিজ দায়িত্বে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরে এসে তাদের মূল্যবান

৭-এর পৃষ্ঠায় দেখুন

বিশ্ব শরণার্থী দিবস-২০২১

হাসান মাহমুদ অয়ন

'টুগেদার উই হিল, লার্ন এন্ড শাইন'- এই প্রতিপাদ্য সামনে রেখে প্রতিবারের মতো এ বছরও মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর বিশ্ব শরণার্থী দিবস-২০২১ পালন করেছে। বিশ্বব্যাপী করোনা মহামারীর কারণে বিগত বছরের মতো এবছরও অনলাইন প্লাটফর্মে দিবসটি উদযাপিত হয়েছে। এ প্রেক্ষিতে গত ২০ জুন, রবিবার মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ফেসবুক পাতায় বিশ্ব শরণার্থী দিবস উপলক্ষে বিশেষ এক অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়। সিএসজিজের কোঅর্ডিনেটর নওরিন রহিম অনুষ্ঠান সঞ্চালনার দায়িত্ব পালন করেন।

অনুষ্ঠানে সূচনা বক্তব্য প্রদান করেন জাতিসংঘের শরণার্থী বিষয়ক হাই কমিশনের বাংলাদেশ প্রতিনিধি জোহানেস ভ্যান ডার ক্লাউ। বক্তব্যের শুরুতেই তিনি বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ পরবর্তী শরণার্থী সংকটের অভিজ্ঞতার কথা স্মরণপূর্বক বর্তমান সময়ে বাংলাদেশ যেভাবে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর পাশে দাঁড়িয়েছে তার প্রশংসা করেন। প্রায় চার বছরধরে বিশালসংখ্যক রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীকে আশ্রয় এবং যথাযথ সুযোগ সুবিধা প্রদানের জন্য তিনি বাংলাদেশ সরকার এবং জনগণের উদারতার কথা তুলে ধরেন। এবারের শরণার্থী দিবসের মূল প্রতিপাদ্য ঘিরে প্রাসঙ্গিক আলোচনা স্থান পায় তাঁর বক্তব্যের বাকি অংশে। বর্তমান সময়ে করোনা মহামারীর কথা উল্লেখ করে তিনি তা মোকাবেলায় ইউএনএইচসিআর এবং

বাংলাদেশ সরকারের সম্মিলিত কার্যক্রম এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার কথা মেলে ধরেন।

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের সেন্টার ফর দি স্ট্যাডি অব জেনোসাইড এন্ড জাস্টিস (সিএসজিজে) শুরু থেকেই শরণার্থীদের নিয়ে নানাভাবে কাজ করছে। মিয়ানমার

৭-এর পৃষ্ঠায় দেখুন

৯ম লিবারেশন ডকফেস্ট ২০২১

প্যানেল ডিসকাশন

জুবাইরিয়া আফরোজ বিনতি

নবম লিবারেশন ডকফেস্টে প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শনের পাশাপাশি ছিল অন্যান্য আয়োজন। যার অন্যতম হচ্ছে প্যানেল ডিসকাশন, চারটি গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা অনুষ্ঠিত হয় যা প্রামাণ্যচিত্র নির্মাণে আগ্রহী তরুণ প্রজন্মের জন্য সহায়ক হবে।

উৎসবের দ্বিতীয় দিনে 'Involvingy Youth in Documenting Muktijuddha' শীর্ষক প্যানেল আলোচনায় অংশ নেন মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ডক্টর সৈয়দ গোলাম ফারুক, মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ট্রাস্টি সারওয়ার আলী, ট্রাস্টি মফিদুল হক, নির্মাতা ফরিদ আহমেদ। আলোচনা অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন উৎসব পরিচালক তারেক আহমেদ। মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে প্রামাণ্যচিত্র নির্মাণের গুরুত্ব নিয়ে আলোচনা করেন বক্তারা। ট্রাস্টি সারওয়ার আলী মনে করেন, মুক্তিযুদ্ধ একটি বহুমাত্রিক কর্মযজ্ঞ। এই বহুমাত্রিক কর্মযজ্ঞ তুলে ধরা অনেক গুরুত্বপুর্ণ যাতে তরুণ প্রজন্ম উপলব্ধি করতে পারে কত বড় ত্যাগের মাধ্যমে দেশ স্বাধীন হয়েছে। তিনি বলেন, 'মানবাধিকার লঙ্ঘন বিষয়ে তরুণরা আমাদের চেয়েও বেশি সক্রিয় এবং সজাগ। তারা বিভিন্ন সৃজনশীল উদ্যোগের মাধ্যমে তার প্রকাশ ঘটাচ্ছে, এটা অনেক বড় প্রাপ্তি।' তিনি আশা করেন, তরুণ প্রামাণ্যচিত্র নির্মাতারা গবেষণাকে আরো বেশি গুরুত্ব দেবেন যাতে এমন কিছু প্রকাশ না হয় যা বস্তুনিষ্ঠ নয়।

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর প্রতিবছর স্কুল পড়ুয়া শিক্ষার্থীদের নিয়ে ওয়ার্কশপের আয়োজন করে। এখানে শিক্ষার্থীদের প্রামাণ্যচিত্র নির্মাণের ধারণা দেওয়া হয় এবং ওয়ার্কশপ শেষে শিক্ষার্থীরা এক মিনিটের প্রামাণ্যচিত্র নির্মাণ করে। এমনি ওয়ার্কশপের মেন্টর প্রামাণ্যচিত্র নির্মাতা ফরিদ আহমেদ জানান, শিক্ষার্থীরা এখন প্রযুক্তিবান্ধব, তাদের কিছু প্রাথমিক ধারণা দিলে নিজ আগ্রহেই তারা কাজ করতে চায়, ইতিহাস নিয়ে সম্যক জ্ঞান থাকলে তারা আরো ভালো করবে।

বর্তমান শিক্ষণ ব্যবস্থা এবং ডকুমেন্টেশন নিয়ে কথা বলেন মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ডক্টর সৈয়দ গোলাম ফরুক। তিনি জানান, বর্তমানে শিক্ষা ব্যবস্থা পরিবর্তন করে কোয়ালিটি এডুকেশনে গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে। অর্থাৎ সফট স্কিল যেমন- ক্রিয়েটিভিটি, ডিজিটলাইজিং, ইমোশনাল বা সোশ্যাল স্কিল ইত্যাদি কীভাবে সমৃদ্ধ করা যায় তাতে গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে। প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থায় যা সম্ভব নয়। তাই নতুন শিক্ষা ব্যবস্থা হতে যাচ্ছে- প্রোজেক্ট বেইস এক্সপিরিয়েন্স লার্নিং। তিনি জানান, সারাদেশের সপ্তম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের কারিকুলামে যোগ হয়েছে 'মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক ডকুমেন্টেশন'। ইতোমধ্যে শিক্ষার্থীরা শিক্ষকদের তত্ত্বাবধানে এলাকার মুক্তিযোদ্ধাদের কাছে গিয়ে ডকুমেন্টেশন করেছে, এতে শিক্ষার্থীদের ব্যাপক আগ্রহও দেখা যাচ্ছে। শিক্ষার্থীদের তৈরি এই ডকুমেনটেশন বা প্রামাণ্যচিত্রগুলো থেকে দশটি বাছাই করা হয়েছে, শীঘ্রই তাদেরকে পুরস্কৃত করা হবে। মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ট্রাস্টি মফিদুল হক জাদুঘরের নানা আয়োজনের কথা তুলে ধরে বলেন, প্রতিবছর জাদুঘর থেকে প্রামাণ্যচিত্র নির্মাণে তরুণ নির্মাতাদের বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করা হচ্ছে। তিনি মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরকে একটি সামাজিক শক্তি হিসেবে আখ্যায়িত করে বলেন, মুক্তিযুদ্ধের যে অসাম্প্রদায়িক সমাজের শিক্ষা দিয়েছে, পাকিস্তানি দ্বিজাতিতত্ত্বের সমাজ থেকে কিভাবে সম্প্রীতির সমাজে রূপান্তর ঘটলো সেই শিক্ষা এখন অনেক জরুরি।

Full program: https://fb.watch/6DDa1rQF6f/

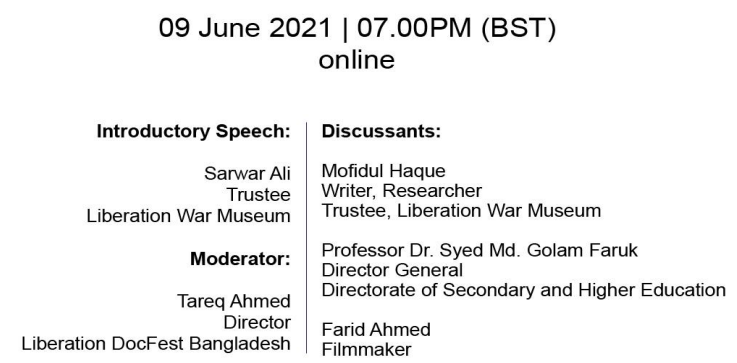

Women Filmmaker as a Community
Post-Independence Era

মুক্তি ও মানবাধিকার বিষয়ক প্রামাণ্যচিত্র উৎসব '৯ম লিবারেশন ডকফেস্ট ২০২১'-এর তৃতীয় দিনে 'Women Filmmaker as a Community: Post Independence Era' শিরোনামে প্যানেল আলোচনায় অংশ নেন মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ট্রাস্টি ও সদস্য-সচিব সারা যাকের, নির্মাতা শবনম ফেরদৌসী, রাওয়ান সায়মা, আকরাম খান এবং সম্পাদক চৈতালী সমাদ্দার। অনুষ্ঠান সঞ্চালন করেন ফাহমিদা আক্তার। আলোচনা শুরু হয় কবি ও চলচ্চিত্র নির্মাতা বুদ্ধদেব দাসগুপ্তের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ ও এক মিনিট নিরবতা পালনের মাধ্যমে। প্রশ্ন জাগে কেন স্বাধীনতার পঞ্চাশ বছর পরেও আমাদের দেশে চলচ্চিত্র নির্মাণে নারীদের অংশগ্রহণ তুলনামূলক কম? তবে আলোচকরা আশাবাদ ব্যক্ত করেন যে এখন নারীরা চলচ্চিত্র নির্মাণে আগ্রহী হচ্ছে। নারীদের অংশগ্রহণ এবং চলচ্চিত্র নির্মাণে নারীরা কী-ধরণের বাধার সম্মুখীন হচ্ছে এই বিষয়েও আলোচনা হয়।

পরিচালনা, চিত্রগ্রহণ এবং সম্পাদনায় পারদর্শী রাওয়ান জানান, 'আমাদের দেশে মেয়েদের টেকনোলজি নিয়ে অবমূল্যায়ন করা হয়'। তিনি কারো উপরে নির্ভর করতে চাননি, শিখেছেন নিজ আগ্রহেই। তিনি বলেন, গাইডলাইন হিসেবে ফিল্ম স্কুলের অবশ্যই গুরুত্ব রয়েছে, তবে যে কোন মাধ্যমেই চলচ্চিত্র শেখা যায়। ছোটবেলা থেকেই চলচ্চিত্র নির্মাণের স্বপ্ন দেখা চৈতালি সমাদ্দার সম্পাদনা নিয়ে পড়াশোনা করেছেন ভারতের একটি ফিল্ম স্কুলে। তিনি জানান পরিবারের সমর্থনেই তার এতদূর আসা। দেশে ফিরে স্বাধীনভাবে সম্পাদনা করছেন, চলচ্চিত্র সম্পাদনাড প্রথমদিকে নারী হওয়ার কারণে তাকে বিভিন্নভাবে বঞ্চনার মুখোমুখি হতে হয়। তার পরেও সব বাধা পেরিয়ে কাজ করে যাবেন বলে আত্মবিশ্বাসী চৈতালী সমাদ্দার।

চলচ্চিত্র সংসদ আন্দোলন থেকে প্রামাণ্যচিত্র নির্মাতা হিসেবে নিজেকে গড়ে তোলার গল্প বললেন বাংলাদেশের অন্যতম প্রামাণ্যচিত্র নির্মাতা শবনম ফেরদৌসী। জন্মসাথী, নহ মাতা নহ কন্যা, লেডি উইথ দ্য ল্যাম্পসহ বেশ কয়েকটি প্রামাণ্যচিত্র নির্মাণ করেছেন তিনি এবং পুরস্কার পেয়েছেন একাধিকবার।

নারী চলচ্চিত্র কর্মীদের সাথে কাজের অভিজ্ঞতা নিয়ে জানতে চাইলে নির্মাতা আকরাম খান জানান, 'আমার সাথে কাজ করে এমন অনেক নারী সহযোগি আছেন যারা অনেক মেধাবি, নারীরা নির্মাণে অংশগ্রহণ করলে আমরা একটা নতুন দৃষ্টিভঙ্গি দেখতে পাব যা সমাজের জন্য এখন অনেক গুরুত্বপুর্ণ'। চলচ্চিত্র থেকে শুরু করে সব জায়গায় নারীবান্ধব পরিবেশ তৈরির গুরুত্বও তুলে ধরেন তিনি। নারীদের একসাথে কাজ করা নিয়ে নির্মাতারা বলেন, তারা অন্য নারী নির্মাতাদের সাথে কাজ করতে যেমন স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করেন তেমনি তাদের কাজের সমালোচনাও করেন। তারা নিজেদের জ্ঞান আদান প্রদানের মাধ্যমে একসাথে কাজ করে যেতে চান। নারী চলচ্চিত্রকর্মীদের কোন ফোরাম বা সংগঠন আছে কিনা তার উত্তরে তারা বলেন, নারী-পুরুষ আলাদা করে না ভেবে নির্মাতা বা চলচ্চিত্রকর্মী হিসেবেই ভাবতে ভালোবাসেন বা কাজ করে যেতে চান তিনি।

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ট্রাস্টি ও সদস্য-সচিব সারা যাকের নারী নির্মাতাদের আহবান করে বলেন, তারা যেন নতুন নারী চলচ্চিত্রকর্মীদের মেন্টরিং করেন, যাতে নারীরা চলচ্চিত্র নির্মাণে আরো সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করতে পারে। Full Program: https://fb.watch/6DDfJ-PeJL/

ইয়াং ফিল্মমেকিং কমিউনিটি
একাডেমিক এডুকেশন অ্যান্ড ক্যারিয়ার

'নবম লিবারেশন ডকফেস্ট' এর অংশ হিসেবে একটি প্যানেল আলোচনা আয়োজন করা হয় বাংলাদেশের তরুণ চলচ্চিত্র নির্মাতাদের নিয়ে। আলোচনায় অংশ নেন তরুণ নির্মাতা তাসমিয়াহ আফরিন মৌ, আরিফুর রহমান, মাহাদী মোস্তফা, মাহাদি হাসান এবং মাহাবুব হোসেন। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন এলিজাবেথ ডি কস্তা এবং গোপা বিশ্বাস সিজার। আলোচ্য বিষয় ছিল, ইয়াং ফিল্মমেকিং কমিউনিটি : একাডেমিক এডুকেশন অ্যান্ড ক্যারিয়ার। নির্মাতারা তাদের একাডেমিক ও ব্যবহারিক শিক্ষা কিভাবে কর্মজীবনে কাজে লাগাচ্ছেন সে বিষয়ে আলোচনা করেন। বিসিটিআই-এর প্রথম ব্যাচের ছাত্র হিসেবে মাহবুব হোসেন তার অভিজ্ঞতা জানান। চলচ্চিত্রের শিক্ষার্থী হওয়াতে ইন্ডাস্ট্রিতে কি ধরনের বৈষম্যের শিকার হন, বাংলাদেশে চলচ্চিত্রে ভালো টেকশিয়ানের অভাব এবং ইন্সটিটিউটগুলো ভালো টেকশিয়িয়ান তৈরিতে কি ধরণের ভুমিকা রাখছে এ বিষয়েও কথা বলেন তারা। এছাড়াও নির্মাতারা দেশে এবং বিদেশে কাজ করার বিভিন্ন অভিজ্ঞতা তুলে ধরেন।

Full program: https://fb.watch/v/19bJ0HpXl/

উৎসব-এর চতুর্থ দিনের প্যানেল আলোচনায় যোগ দিলেন দক্ষিণ এশিয়ার দেশসমূহের প্রতিষ্ঠিত প্রামাণ্যচিত্র নির্মাতাগণ। বাংলাদেশ থেকে অংশগ্রহণ করেন সামিয়া জামান, ভারত থেকে সুপ্রিয় সেন ও মিরিয়াম চান্দি, আফগানিস্তান থেকে সাহরা মানি, নেপাল থেকে প্রসান্না দংগল এবং পাকিস্তান থেকে জাকির থাভের ।

প্যানেল আলোচনা সঞ্চালনা করেন উৎসবের পরিচালক তারেক আহমেদ এবং পাকিস্তানের চলচ্চিত্র নির্মাতা আনাম আব্বাস।

প্যানেল আলোচনার শুরুতে শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন কসমস ফাউন্ডেশনের প্রতিষ্ঠাতা ও চেয়ারম্যান, সাংবাদিক এনায়েত উল্লাহ খান। আলোচকরা দক্ষিণ এশিয়ার প্রামাণ্যচিত্রের বর্তমান পরিস্থিতি এবং করণীয় নিয়ে আলোচনা করেন।

Full Program: https://www.facebook.com/Liberationdocfestbd/videos/543333430033334

শেখ আল মামুনের হোয়াই নট?: একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রামাণ্যচিত্র

আলম খোরশেদ, *সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব*

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর আয়োজিত সদ্য সমাপ্ত নবম *মুক্তি ও মানবাধিকার চলচ্চিত্রোৎসবের* জুরি দায়িত্ব পালনের শ্রেষ্ঠ পুরস্কার আমার জন্য নিঃসন্দেহে শিরোনামে উল্লেখিত প্রামাণ্যচিত্রটি দেখার সুযোগ পাওয়া। অনেকের মতো আমারও বিশ্বাস, মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম প্রধান ভুক্তভোগী ছিলেন আমাদের নারীসমাজ; বিশেষ করে যে-দুই লক্ষ নারী পাকিস্তানি সেনা ও তাদের দেশীয় দোসরদের দ্বারা বর্বরভাবে নির্যাতিত হয়েছেন, তাঁদের শারীরিক, মানসিক ক্ষত ও ক্ষতির সত্যি কোনো সীমা-পরিসীমা নেই। এই বিষয়টি আমাদের শিল্প-সাহিত্যে ইতঃপূর্বে নানাভাবে উপস্থাপিত ও আলোচিতও হয়েছে নানাভাবে। এই প্রসঙ্গে ড. নীলিমা ইব্রাহিমের অমর গ্রন্থ *আমি বীরাঙ্গনা বলছি* ও একক-নাটক *লাল জমিন*, *বীরাঙ্গনা: উইমেন অভ ওয়ার* ইত্যাদির কথা মনে আসে প্রথমেই। পাশাপাশি এই তালিকায় দুটো শক্তিশালী প্রামাণ্যচিত্রের কথাও উল্লেখ করতে হয় বইকি: ফারজানা ববি নির্মিত *বিষকাঁটা* ও লীসা গাজী পরিচালিত *রাইজিং সাইলেন্স* বা *নৈঃশব্দ্যের শব্দ*। এই ধারারই সর্বশেষ সংযোজন *হোয়াই নট?*, যেখানে এর নির্মাতা, দক্ষিণ কোরিয়া-প্রবাসী বাঙালি তরুণ শেখ আল মামুন সম্পূর্ণ নতুন একটি মাত্রা যোগ করে বিষয়টিকে আমাদের নিজস্ব, স্থানীয় ইতিহাসের গণ্ডি থেকে বার করে এনে যুক্ত করে দিতে সক্ষম হন বিশ্ব ইতিহাস ও রাজনীতির বৃহত্তর প্রেক্ষাপটের সঙ্গে।

আমরা জানি, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় শত্রুপক্ষ জাপানি সেনাদের হাতে কোরিয়ার অসংখ্য নারী নির্যাতিত ও ধর্ষিত হয়েছিল, যাদের কপালেও অনেকটা আমাদের *বীরাঙ্গনার* মতোই *কম্ফোর্ট ওমেন* নামের একটি অস্বস্তিকর অভিধা জুটেছে। এদের অনেকেই আজ আর হয়তো বেঁচে নেই,

কিন্তু তাঁদের আত্মত্যাগ ও লড়াই সংগ্রামের ইতিহাস তাই বলে বিলুপ্ত হয়ে যায়নি। তাঁদের উত্তরসূরিদের কেউ কেউ এবং ইতিহাসের সত্যের প্রতি দায়বদ্ধ অনেক সচেতন নাগরিক, গবেষক, বুদ্ধিজীবী এখনও জাপান সরকারের কাছ থেকে আনুষ্ঠানিক ক্ষমাপ্রার্থনা ও ক্ষতিপূরণের জন্য সোচ্চার ও সরব রয়েছেন। আলোচ্য *হোয়াই নট?* ছবিটির নির্মাতা অত্যন্ত বুদ্ধিমত্তা ও বিবেচনার সঙ্গে, এখনও বেঁচে থাকা বাংলাদেশের বীরাঙ্গনাদের নিয়ে নির্মিত এই ছবিটির একই সমান্তরালে কোরীয় ইতিহাসের সেই করুণ আখ্যানটিকে জুড়ে দিয়ে, এটিকে এক ভিন্নতর মাত্রা ও ব্যঞ্জনা প্রদান করেন। এর মাধ্যমে এটাই আরও একবার প্রমাণিত ও প্রতিষ্ঠিত হলো যে, যুদ্ধকালে নারীর ওপর এহেন পৈশাচিক নির্যাতন একটি বৈশ্বিক বাস্তবতা এবং এই মানবতাবিরোধী অপরাধের বিচারের দাবিটিকে একটি বৈশ্বিক দাবি হিসাবেই বিবেচনা করতে হবে সংশ্লিষ্ট সবাইকে। সেইদিক থেকে চিন্তা করলে, *হোয়াই নট?*, ছবিটিকে এরকম একটি সর্বজনীন ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে নির্মাণ করার মাধ্যমে পরিচালক সেই সময়োপযোগী দায়িত্বটিই পালন করেন অত্যন্ত সুচারুভাবে। এর জন্যে সত্যি শতমুখে সাধুবাদ পাওয়ার যোগ্য তিনি।

এছাড়া, চলচ্চিত্রের আঙ্গিকগত ভাষার আলোকেও যদি দেখি তাহলেও বলতে দ্বিধা নেই যে, সেই পরীক্ষাতেও সসম্মানেই উতরে গেছে এই ছবিটি। স্বীকার্য যে, এটি প্রামাণ্যচিত্র নির্মাণরীতির মূলধারারই অনুসারী, অর্থাৎ এতে কোনো নিরীক্ষা কিংবা সৃজনশীলতার তেমন কোনো প্রয়োগ-প্রকাশ নেই। কিন্তু এর বাইরে বিষয়বস্তু নির্বাচন, তার জন্য প্রয়োজনীয় গবেষণা, গল্পের একটা যৌক্তিক কাঠামো নির্মাণ; সেই কাঠামোর মধ্যেই তাঁর উদ্দিষ্ট বক্তব্য ও বিষয়ভাবনাকে অত্যন্ত বিশ্বাসযোগ্য এবং আন্তরিকভাবে উপস্থাপনা করা- এর প্রত্যেকটি ক্ষেত্রেই তিনি যথেষ্ট মুন্সিয়ানার পরিচয় দিয়েছেন। সর্বোপরি ক্যামেরাচালনা, আবহনির্মাণ, শব্দধারণ, আলোর ব্যবহার এবং চরিত্রদের স্বতঃস্ফূর্ত, মর্মস্পর্শী ভাষ্য উপস্থাপন– সবকিছুতেই ছিল পরিমিতি ও পেশাদারিত্বের ছাপ। বোঝা যায়, শুধু বিষয়ভাবনা নয়, চলচ্চিত্রের প্রায়োগিক ও প্রাযুক্তিক বিদ্যাতেও যথেষ্ট পারঙ্গম মামুন। আমরা আশা করব, তিনি তাঁর এই প্রগাঢ় দেশাত্মবোধ, ইতিহাসচেতনা, রাজনীতিমনস্কতা এবং চলচ্চিত্রের শিল্পজ্ঞানটুকু কাজে লাগিয়ে ভবিষ্যতেও আমাদেরকে সমৃদ্ধ করবেন আরও নবনব সৃষ্টির সম্ভারে। সবশেষে, ছবির নামটি নিয়ে কিন্তু একটা খুঁতখুঁতুনি রয়েই গেল মনে। গুরুগম্ভীর বিষয় ও গভীরতর বোধের বাহন এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক দলিলের নামটি মনে হয় আরেকটু অর্থপূর্ণ ও তাৎপর্যময় কিছু হলেই যথার্থ হতো।

Film review: Son of the streets

By Shamonti Adrita

"Son of the streets" is a short documentary film by film maker and director Mohammed Almughanni. It was selected and awarded at numerous film festivals around the world such as – "The Silver Eye Award" at Ji.hlava Film festival Prague, Czech Republic, 2020, "The Youth Jury Award" at Liberation Docfest, Dhaka, Bangladesh, just to name a few. He has made other award-winning narrative and documentary films such as "Blacklisted" (2020), "Falafala" (2019), "Operation" (2018), to name a few.

This documentary film takes us through the daily life of a thirteen-year-old boy named Khodor, whose family is trying to issue him an ID document that proves his existence and gives him right to education, healthcare and movement outside of the Palestinian refugee camp of Shatila in Beirut, Lebanon. Over the course of the entire film many of the old family secrets gets revealed.

This films perfectly encapsulates the reality of many children across the world, not just Khodor. Technically he's a nobody. As per according to the law he does not even exist, and yet he is surrounded by people who do care for him and love him. People who are trying their best to provide him a better chance at life.

As the film moves on, we see this innocent, young and enthusiastic teenage boy, going about his daily life having fun with friends, working and even having a girlfriend. Everything one would expect of a typical teenage boy, yet he is acutely aware of the fact that he is an "orphan", with such complex family dynamics and parentage, much of which he does not fully understand. We see his family trying their level best to provide him with an ID, which proves his existence in society, but at times you could see them losing their patience and getting frustrated. But they still carry on, not giving up on him.

To me what makes this an exceptionally brilliant film is the overall cinematography – the way it is done, is so simple and yet extremely captivating and aesthetic to watch. The editing, music, camera angles and color – everything was in complete sync with the flow of the story.

It is so captivating, that I literally felt as if I was getting pulled into the film. Like I myself was literally there in that place and time following Khodor or watching his family converse. As the film went on, I thought that I myself could feel the confusion, the curiosity and the enthusiasm displayed in Khodor's eyes.

Now, I could go on and on about what a brilliant experience "Son of the streets" is, but it still wouldn't be enough. So, to conclude, it is a film worth watching, especially if you like short films and documentary films. It most certainly provides you with a different perception of the world we live in. Makes you realize exactly how fortunate some of us are.

Interview

Mahdi Fleifel, director of 3 Logical Exits

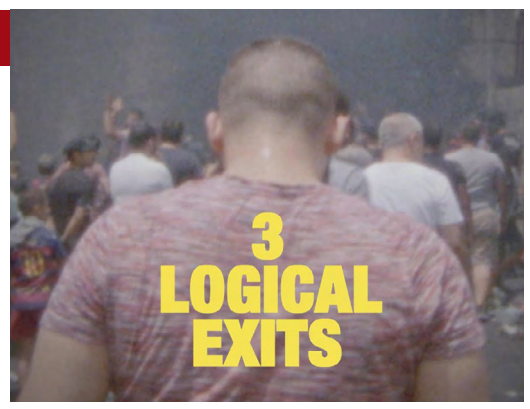

— Natasha Ruwona

GSFF speaks to Mahdi Fleifel about his film 3 Logical Exits. The film reunites us with Reda, a Palestinian stranded in the Ain el-Helweh refugee camp in Lebanon and the protagonist of two of Fleifel's previous films. The film is a sociological meditation on the different "exits" that young Palestinians choose, in order to cope with life in the refugee camps.

First of all I just wanted to say thank you for this film, it's beautifully shot and tells of important stories that need to be shown. Obviously the subject matter is one that is very difficult, and I wanted to ask you about the emotional impact of filming. I think about this in my own work a lot - how certain topics can be triggering and how to protect my own mental health while doing the necessary work of engaging with hard topics. How was the filming process for you and what things did you need to consider for yourself as a director, but also as a human being faced with the challenges of representing these stories accurately while maintaining your own feelings and concerns?

I have been filming in the camp for more than a decade and Reda is someone I know very closely. To me it never feels like I'm an outsider coming in to document a strange world. It's my own world, and although I don't live there, I'm from there and I belong there. It makes me feel completely integrated to document what I see, even if most of the things I witness make me feel hopeless. The fact that I am able to record it so closely, gives me a sense of hope. In a strange way it gives me strength. To me, my films are very personal, and they're the attempt to hold on to the forgotten, and mark what shouldn't be erased from collective memory.

You used the same protagonist in 3 Logical Exits within your films XENOS and A Man Returned. How did you build and maintain that relationship with Reda through his journey? He seems very comfortable with you and so many of the shots feel quite intimate due to the filming style, in some ways you forget the camera is on him when he's talking to you, as he speaks so naturally.

I have known Reda since he was ten years old, he is my grandfather's neighbour and I have documented his life for the past 20 years.

Lastly, can you talk a little bit about the format of storytelling that you took within 3 Logical Exits. At parts, Reda is narrating, but you also have a narration role as well as the woman who speaks in conversation with you, can you talk about the choices that you made for telling the story?

I wanted to continue playing with the form I had in my two previous shorts, XENOS and I Signed the Petition, where I use phone calls as a narration. Here it was important to have Reda's story placed in a broader context relating to the Palestinian youth in the camps today. When I had filmed Reda in the summer of 2019, I had just read my friend Marie Kortam's report - she's a sociologist and her focus has been on Palestinian refugees in Lebanon. I wanted to shed light on her ideas and observations about these 'logical exits'. To me the form of 3 Logical Exits was a sort of fragmented audio-visual journal of my experience in Ain El-Helhweh last summer. I wanted to stay true to that, and keep it as raw and intense as I experienced it.

ইন্টারন্যাশনাল ক্রিমিনাল কোর্ট সামার স্কুল
জেনোসাইড স্টাডি সেন্টার-এর যোগদান

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর পরিচালিত সেন্টার ফর দ্যা স্টাডি অব জেনোসাইড এন্ড জাস্টিসের (CSGJ) স্বেচ্ছাসেবক ফয়সাল শাহরিয়ার রাতুল গত ৮ থেকে ১১ জুন ২০২১ পর্যন্ত দি আইরিশ সেন্টার ফর হিউম্যান রাইটস, ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি অফ আয়ারল্যান্ড গলওয়ে কর্তৃক আয়োজিত ইন্টারন্যাশনাল ক্রিমিনাল কোর্ট সামার স্কুলে যোগদান করে সফলতার সাথে সমাপ্ত করে। বিশ্বব্যাপী করোনা মহামারীর কারনে এই বছরের সামার স্কুল অনলাইনে জুম প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে আয়োজিত হয়। সামার স্কুল চার দিনে বিভক্ত ছিলো। প্রতিদিন ৩টা সেশন থাকতো, সর্বমোট ১২টি সেশন হয়েছে এই চার দিনে।

প্রথম দিনের তিনটি লেকচার ছিলো Introductory। প্রথম সেশনে, এমিরেটাস প্রফেসর উইলিয়াম শাবাস সামার স্কুলটির ঐতিহাসিক সূচনা এবং রোম স্ট্যাটুটের খসড়া প্রণয়ন এবং সেই কনফারেন্সের স্মৃতি ভাগাভাগি করেন অংশগ্রহণকারীদের সাথে। এরপর ড. রড রাস্তান (আইসিসির, প্রসিকিউটর অফিসের লিগ্যাল এডভাইজার), আইসিসির গঠনতন্ত্র এবং মুল বিচার্য বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন। সর্বশেষ আলোচক ছিলেন ড. ফ্যাব্রিচিও গুয়ারিগ্লিয়া, যিনি আইসিসির প্রসিকিউশন ডিভিশনের ডিরেক্টর। তাঁর আলেচ্য বিষয় ছিলো আইসিসির প্রসিকিউটরিয়াল পলিসি নিয়ে ।

দ্বিতীয় দিনের প্রতিপাদ্য ছিলো মূলত আন্তর্জাতিক অপরাধ (International Crimes) ও এর ধরন এবং আইসিসিতে এদের বিচার কার্য। দ্বিতীয় দিনের প্রথম সেশনে প্রফেসর গ্যুনায়েল মেতরো, (কসভো স্পেশালিস্ট চেম্বারের বিচারক), Ad-Hoc ট্রাইব্যুনাল, আইসিসিতে গণহত্যা এবং মানবতা বিরোধী অপরাধের বিচার এবং বিগত বছরের কেসগুলো নিয়ে কেস স্টাডির উপর আলোকপাত করেন। তার আলোচনায় বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে যুদ্ধাপরাধীদের বিচার এবং রোহিঙ্গা সংকট উঠে আসে এবং আলোচিত হয়।

দ্বিতীয় লেকচার দেন প্রফেসর ড. শেইন ডারসি, যিনি আইরিশ সেন্টার ফর হিউম্যান রাইটস, ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি অফ আয়ারল্যান্ড গলওয়ের একজন স্কলার এবং সামার স্কুলের সমন্বয়ক। তিনি আলোচনা করেন, Modes of Criminal Liability নিয়ে। রোম স্ট্যাটুটের কোন সেকশনগুলো ক্রিমিনাল লায়াবিলিটি দাঁড় করাতে সাহায্য করে এবং কিভাবে আইসিসির কিছু কেস এই লায়াবিলিটি জ্যুরিস্প্রুডেন্সকে আরো স্বচ্ছতা এবং স্পষ্টতা এনে দিয়েছে। এরপর ইউনিভার্সিটি অফ দি ওয়েস্ট অফ ইংল্যান্ডের প্রফেসর ড. নোয়েল ক্যুয়েনিভেত Sexual and Gender based violence বিষয়ে আলোচনা করেন, প্রসঙ্গক্রমে যুদ্ধ শিশু এবং ৭২ সালে বাংলাদেশের অভিজ্ঞতা ও স্মৃতি ভাগাভাগি করা হয় ক্লাসের সকলের সাথে।

তৃতীয় দিন আইসিসির রুলস এন্ড প্রসিডিউর নিয়ে ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভিক্টিমস কাউন্সেল নাদা কিসওয়ানসন আইসিসির সামনে কিভাবে ভিক্টিমকে নিয়ে আসা হয় এবং অভিযুক্তের বিরুদ্ধে তার সাক্ষ্য আদালত নেয় তা তুলে ধরেন। দ্বিতীয় লেকচার ছিলো, প্রফেসর রে মাফ্রির এগ্রেসন এন্ড ওয়ার ক্রাইমস নিয়ে। আইসিসি কিভাবে এবং কোন এখতিয়ারে এইসকল কেস নিতে পারে সেটি তিনি তাঁর লেকচারে আলোচনা করেন। এই দিনের সর্বশেষ ক্লাস ছিলো আয়ারল্যান্ডের পাবলিক প্রসিকিউশন অফিসের ডিরেক্টর, প্রসিকিউটর পল ব্র্যাডসেনের। তিনি আইসিসিতে কেসগুলো কিভাবে কোন রুলস এন্ড প্রসিডার ফলো করে এবং এই রুলস ফলো না করলে যে অনেক সময় অভিযুক্তের পক্ষে রায় চলে যায় সেটি নিয়ে তিনি বিস্তর আলোচনা করেন এবং আইসিসির কিছু এক্সেপশনাল রুলও বুঝিয়ে দেন।

চতুর্থ বা সর্বশেষ দিনে আলোচনা ক্লাসগুলো ছিলো একটু ভিন্ন ধরনের। প্রথম ক্লাস নেন আইসিসি এবং আইসিটির ডিফেন্স কাউন্সেল কেট গিবসন। তিনি ব্যাখ্যা করেন, কিভাবে তিনি বিগত কয়েক দশক ধরে পৃথিবীর এই সকল আন্তর্জাতিক অপরাধীদের আইসিসিতে প্রতিনিধিত্ব করছেন এবং তাঁর মত কিছু নামকরা, ভাল আইনজীবি সব সময় অপরাধীদের আইসিসি/আইসিটিতে প্রতিনিধিত্ব করেন যাতে আইনের ন্যায়পরানয়তা অক্ষুন্ন থাকে এবং কেউ যেন আইসিসিকে দায়ী করতে না পারে যে, ডিফেন্স কাউন্সেল যথেষ্ট অভিজ্ঞ; দক্ষ ও বিজ্ঞ ছিলো না এবং অভিযুক্ত আসামী ন্যায্য বিচার পায়নি। এই দিনের দ্বিতীয় সেশনে কেনিয়াটা ইউনিভার্সিটির স্কুল অফ সিকিউরিটি, ডিপ্লোমেসি এন্ড পিস স্টাডিসের প্রফেসর ড. জেমস নিয়ায়ো African States, Harmony & Discord with the International Criminal Court বিষয়ের ওপর আলোকপাত করেন। ড. জেমস তাঁর বক্তব্যে পশ্চিমা দেশগুলোর আফ্রিকান দেশগুলোর ওপর হেজিমনি তৈরী করা এবং ইউরোপ কর্তৃক কিভাবে আফ্রিকান দেশগুলোকে বিভিন্ন ট্রিটির মাধ্যমে একরকম বাধ্য করে রোম স্ট্যাটুটের স্টেট পার্টি বানানো হয়েছে তার ব্যাখ্যা দেন। সামার স্কুলের সর্বশেষ লেকচার দেন হিউম্যান রাইটস ওয়াচ-এর মারিয়া এলেনা ভিগ্নোলি, তিনি জানারেন কিভাবে সিভিল সোস্যাইটি অর্গানাইজেশনগুলো, আইসিসি ও এর কর্মকাণ্ডকে অডিট করে এবং CICC-এর মাধ্যমে আইসিসির স্টেট পার্টি বানানোর জন্য বিভিন্ন দেশে লবিং বা সোশ্যাল এওয়ারনেস করে যাতে রাজনীতিবিদরা তাদের কর্মকাণ্ডের জন্য আন্তর্জাতিক চাপের মুখে থাকে। সামার স্কুল অংশগ্রহণকারীদের জন্য বেশ শিক্ষাদায়ক ছিলো। বিশেষ করে একজন বাংলাদেশী হিসেবে আন্তর্জাতিক আইনে পদচারণা সাম্প্রতিক হলেও বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক অপরাধ আইনে আমাদের অবদান এবং কীর্তি অনেক। সামার স্কুলের বিভিন দেশের একাডেমিকদের মুখে শুনে তা উপলব্ধি করা থেকে। আশা করা যায় যে, নতুন করে বাংলাদেশ-মায়ানমার রোহিঙ্গা ইস্যুতে একটি ল্যান্ডমার্ক কেস আমরা আইসিসির সামনে পেতে যাচ্ছি।

ফয়সাল শাহরিয়ার রাতুল
আইন ও বিচার বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় এবং স্বেচ্ছাসেবক, মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর (CSGJ)

জল্লাদখানা বধ্যভূমির সন্তানদলের অনলাইন কার্যক্রম
গান ও কবিতা প্রশিক্ষণ

বিশ্বব্যাপী করোনা মহামারির কারনে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর বন্ধ থাকলেও ভার্চুয়াল জগতে জাদুঘরের উপস্থিতি নিঃসন্দেহে এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করে চলেছে। বারবার বাধাপ্রাপ্ত হলেও থেমে নেই কিছুই। তারই ধারাবাহিকতায় ২ জুলাই সন্ধ্যা সাতটায় মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর পরিচালিত মিরপুরস্থ জল্লাদখানা বধ্যভূমি স্মৃতিপীঠে শহিদদের তৃতীয় প্রজন্মের সন্তানদের নিয়ে গঠিত বধ্যভূমির সন্তানদলের ১৫ জন শিক্ষার্থীর অংশগ্রহণে শুরু হয় অনলাইনে গান শেখার ক্লাস। করোনা মহামারির কারনে তিন মাস পর আবারো সন্তানদলের গানের অনুশীলন শুরু হয়। অনলাইনভিত্তিক ক্লাসে যুক্ত ছিলেন মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের অন্যতম ট্রাস্টি মফিদুল হক, ব্যবস্থাপক চন্দ্রজিৎ সিংহ ও কর্মসূচি ব্যবস্থাপক রফিকুল ইসলাম। ক্লাসের শুরুতে সন্তানদলের শিক্ষার্থীদের পরিচয় পর্বের পর শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন মফিদুল হক। তিনি অনলাইনে গান শেখার এই কার্যক্রমকে সাধুবাদ জানান। মুক্তিযুদ্ধ ও শহিদদের কথা, দেশমাতৃকার কথা শহিদদের তৃতীয় প্রজন্ম বধ্যভূমির সন্তানদল তাদের কণ্ঠে ধারণ করে যেন সর্বস্তরে ছড়িয়ে দেয় এবং গানের চর্চা যেন অব্যাহত থাকে সেই আশাবাদ ব্যক্ত করেন। শুভেচ্ছা বক্তব্যের পর শিক্ষার্থীরা শহিদদের স্মরণে ‘মুক্তির মন্দির সোপান তলে’ গানটি সমবেত কণ্ঠে পরিবেশন করে। তারপরই শুরু হয় মূল শিক্ষণ। কিছু সরগম চর্চার পর জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের ‘জয় হোক জয় হোক’ গানটি শেখানো হয়। পাশাপাশি বেশ কিছু দেশাত্ববোধক গান গাওয়া হয়।

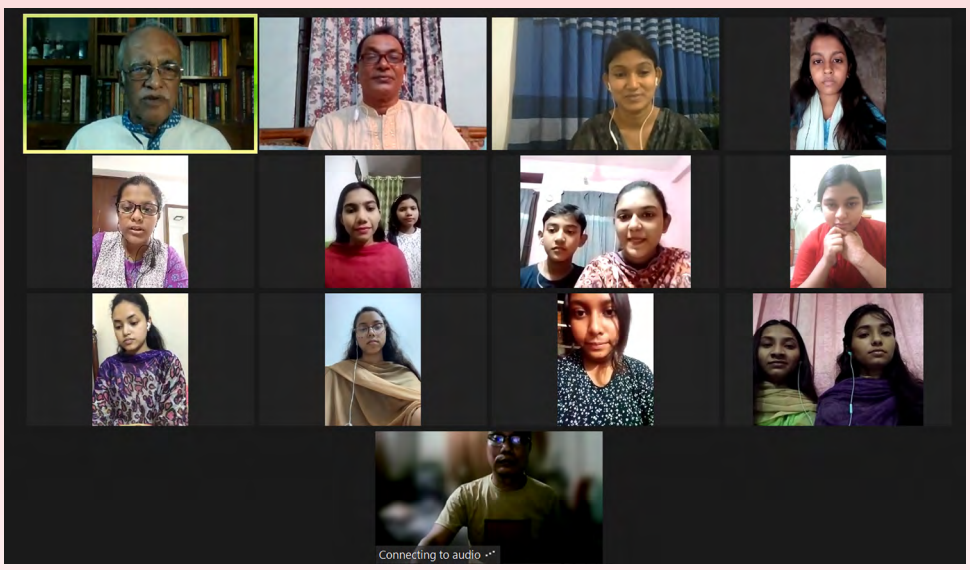

পরবর্তী ক্লাসের শুরুতে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের কর্মসূচি ব্যবস্থাপক রফিকুল ইসলাম কবিতা প্রশিক্ষণের ক্লাস করাবেন। প্রতি শুক্রবার এই ক্লাসের কার্যক্রম চলমান থাকবে। অনুশীলন শেষে শহিদদের উত্তরসূরী বধ্যভূমির সন্তানদলের শিক্ষার্থীরা গেয়ে ওঠে-

‘জয় হোক জয় হোক। শান্তির জয় হোক, সাম্যের জয় হোক।
সত্যের জয় হোক জয় হোক’

প্রমিলা বিশ্বাস

Director's Interview

WHY NOT– *A film by Sheikh Al - Mamun*

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর আয়োজিত 'মুক্তি ও মানবাধিকার বিষয়ক আন্তর্জাতিক প্রামাণ্যচিত্র' উৎসবের নবম আসরে সপ্তম দিনের 'আর্টিস্ট টক' আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন চলচ্চিত্র নির্মাতা শেখ আল মামুন এবং অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন নওরিন রহিম, কো-অর্ডিনেটর, সেন্টার ফর দ্য স্টাডি অব জেনোসাইড অ্যান্ড জাস্টিস, মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর।

নওরিন রহিম : সুদুর দক্ষিণ কোরিয়া থেকে জয়েন করার জন্য ধন্যবাদ। প্রথমেই আপনি যদি আপনার এই 'WHY NOT' প্রামাণ্যচিত্রের শুরু সম্পর্কে দর্শকদের কিছু বলতেন।

শেখ আল মামুন : আমি প্রায় ২৩ বছর বয়সে দক্ষিণ কোরিয়ায় আসি। তখন আমি কমফোর্ট ওমেনদের সম্পর্কে জানতে পারি। এশিয়ার এই কমফোর্ট ওমেনদের কথা অনেকের অজানা। আমরা অনেকে মনে করি জাপান সূর্য উদয়ের দেশ এবং তারা অনেক ভদ্র। কিন্তু দক্ষিণ কোরিয়া যখন জাপানের উপনিবেশ ছিলো তখন নারীরা কিভাবে অত্যাচারিত এবং নিপীড়িত হয়েছে তা সেভাবে উপস্থাপন করা হয়নি। ঠিক তেমনি বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় নারীরা যেভাবে অত্যাচারিত এবং নিপীড়িত হয়েছে তাও সেভাবে উপস্থাপন করা হয়নি। এই প্রামাণ্যচিত্রটি এটাই তুলে ধরে যারা অন্যায় করেছে তারা কেন শাস্তি পাবে না? এই প্রামাণ্যচিত্র মানুষের মনে এই বিষয় নিয়ে ভাবার ইচ্ছা বা এ নিয়ে কাজ করার উৎসাহ বাড়াবে আমার মনে হয়।

নওরিন রহিম : প্রামাণ্যচিত্রে ২টি যুদ্ধের কথা বলা হয়ছে, আমরা বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে অনেকে জানি এবং অনেকে অবগত। কিন্তু আপনি যে কমফোর্ট ওমেনদের কথা বললেন সে বিষয়ে অনেকে জানেন না। দক্ষিণ কোরিয়ায় কেন এরকম ঘটনা ঘটেছিল আর কারা কারা এই বিষয় নিয়ে সম্পৃক্ত ছিল?

শেখ আল মামুন : এখানে শুধু দক্ষিণ কোরিয়ার কমফোর্ট ওমেন না অন্যান্য দেশের কমফোর্ট ওমেনও ছিল যেমন- নেদারল্যান্ড, ফিলিপাইন, মালয়েশিয়া, ইন্দনেশিয়ার। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় জাপানিরা তাদের সেনাদের যৌন আকাঙ্ক্ষা মেটানোর জন্যে বিভিন্ন দেশ থেকে বিভিন্ন মাধ্যমে মেয়েদের নিয়ে যেতো। দক্ষিণ কোরিয়ার তখন আর্থিক অবস্থা তেমন ভালো ছিল না, জাপানিরা বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে তাদের কাজ দিবে এই বলে নিয়ে যেত। মেয়েগুলো পরবর্তীতে ফিরে আসতো না কারন তারা মনে করতো ফিরে গিয়ে তারা সমাজে বাস করতে পারবে না। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর কেউ কমফোর্ট ওমেন নিয়ে আর কথা বলে না। ১৯৬৭ সালে দক্ষিণ কোরিয়ার সরকার এবং জাপানের মধ্যে একটি চুক্তি হয়, সেখানেও কমফোর্ট ওমেনদের কথা ছিল না। ৯০ দশকে একজন কমফোর্ট ওমেন এই নিয়ে কথা বলে আর বিচার চায়।

এই ঘটনায় দক্ষিণ কোরিয়ায় সামাজিক আলোড়নের সৃষ্টি হয়। বর্তমানে সেই কমফোর্ট ওমেনদের মধ্যে ১৪ জন জীবিত আছেন

নওরিন রহিম : এই প্রামাণ্যচিত্রটি নির্মাণ করার সময় আপনার এই বিষয়ে কোন ঐতিহাসিক স্থান বা স্থাপনা দেখে আগ্রহ জেগেছে। দক্ষিণ কোরিয়ায় এই বিষয় নিয়ে কি কি ভাস্কর্য বা স্থাপনা রয়েছে?

শেখ আল মামুন : কোরিয়ার অধিকাংশ নাগরিকরা কমফোর্ট ওমেনদের সম্পর্কে জানে এবং এই বিষয় নিয়ে আন্দোলন করে আসছে। সরকারিভাবে তাদের সম্মান করা হয়। তাদের নিয়ে দুইটি সংগঠনও রয়েছে। একটি তাদের সুরক্ষার জন্য কাজ করছে এবং অন্যটি তাদের দাবি নিয়ে কাজ করে যাচ্ছে। দক্ষিণ কোরিয়ার বিভিন্ন জায়গায় ভাস্কর্য স্থাপনা করা হয়েছে। আর এসব ভাস্কর্যের মাধ্যমে বহির্বিশ্বে তাদের ঘটনা প্রচার করছেন। আর জনগণ এক হয়ে ডোনেশনের মাধ্যমে এসব কাজ করেছে যেটা আমার কাজ করার আগ্রহ বাড়িয়েছে।

নওরিন রহিম : কমফোর্ট ওমেনদের নিয়ে সরকারের কি কোন উদ্যোগ আপনার চোখে পড়েছে?

শেখ আল মামুন : বর্তমান সরকার এই বিষয় নিয়ে জাপানীদের বলছেন । কিন্তু ১৯৬৭ সালের আন্তর্জাতিক চুক্তির জন্যে তারা প্রেশার দিতে পারছে না।

নওরিন রহিম : কমফোর্ট ওমেন এবং বিরঙ্গনাদের সাথে কথা বলার সময় কি কি সমস্যার সম্মুখিন হয়েছিলেন এবং চ্যালেঞ্জিং বিষয় গুলো কি ছিল?

শেখ আল মামুন: আমার এই প্রামাণ্যচিত্রটি করার সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ ছিল একজন পুরুষ হয়ে নারীদের অত্যাচারের বিষয়গুলো তাদের কাছ থেকে শোনা। আবেগপ্রবন বিষয় ছিল তাদের জীবনের সেই অত্যাচারের দিনগুলো তাদের আবার মনে করিয়ে দেয়া।

নওরিন রহিম : এই প্রামাণ্যচিত্রে দুইটি দেশের গল্প আমরা দেখেছি আপনি কিভাবে আপনার টিম নিয়ে কাজ করেছেন এবং তাদের সাথে পরিচয় কিভাবে ?

শেখ আল মামুন : দক্ষিণ কোরিয়ার টিম ছিল আমার কলিগরা। বাংলাদেশের বিরঙ্গনাদের নিয়ে কাজ করার সাহস পাই সাইফুল জার্নাল-এর কাছ থেকে। সাইফুল জার্নাল এর আগেও বিরঙ্গনাদের নিয়ে কাজ করেছেন যার মাধ্যমে আমার কাজ করা সহজ হয়ে উঠে। আর আমি যাদের কাছেই গেছি তারা বিভিন্ন ভাবে আমাকে সাহায্য করেছেন।

নওরিন রহিম : আপনি যখন কমফোর্ট ওমেন এবং বিরঙ্গনাদের নিয়ে কাজ করেছেন তখন অনেক তথ্য সংগ্রহ করেছেন । তথ্য সংগ্রহ করার সময় আপনার অভিজ্ঞতা কেমন ছিল?

শেখ আল মামুন: দক্ষিণ কোরিয়ায় কমফোর্ট ওমেন যারা ছিল তারা তাদের ঘটনা নিয়ে কথা বলে এসেছেন তাই তাদের থেকে কথা নিতে তেমন কোন সমস্যা হয় নি। কিন্তু বাংলাদেশে বিরঙ্গনাদের কথা সিরাজগঞ্জ বাদে অন্য সব গ্রামের ঘটনা সম্পর্কে জানতে এবং আমার কথায় জড়তা থাকায় তাদের আমার প্রশ্ন বুঝতেও সমস্যা হয়েছে।

নওরিন রহিম : আপনার এই প্রামাণ্যচিত্রের নির্ধারিত দর্শক কারা?

শেখ আল মামুন : বাংলাদেশ, কারণ আমার নিজের দেশের মানুষ বিরঙ্গনাদের সম্পর্কে জানুক। এছাড়া আন্তর্জাতিক ভাবে আমাদের দেশের যুদ্ধ সম্পর্কে জানার আগ্রহ বাড়ানো এবং গণহত্যা সম্পর্কে প্রচার করা। আর দক্ষিণ কোরিয়া যখন জাপানের উপনিবেশ ছিলেন তখন তারা কিভাবে নির্যাতিত হয়েছে সে বিষয়টি মানুষের মাঝে প্রচার করা। আর ইচ্ছে ছিল আমার এই প্রামাণ্যচিত্র সিরাজগঞ্জ জেলার বিরঙ্গনাদের দেখান, কিন্তু করোনার কারনে এটি করতে পারি নি।

নওরিন রহিম : নতুন নির্মাতা যখন মুক্তিযুদ্ধ বা যুদ্ধাপরাধ বিষয়ে কাজ করবে তাদের জন্যে আপনি কি পরামর্শ দিবেন?

শেখ আল মামুন : আসলে যারা প্রামাণ্যচিত্র নিয়ে কাজ করতে চায় তাদের সর্বপ্রথম ইচ্ছে থাকতে হবে। প্রামাণ্যচিত্র আপনি পরিচালনা করছেন কিন্তু গল্পটা অন্যের তাই যাদের নিয়ে কাজ করবেন তাদের সম্পর্কে জানা, আমি কি বলতে চাই বা কি নির্মাণ করতে চাই সেটা উপস্থাপন করতে হবে।

নওরিন রহিম : আপনার জন্য শুভকামনা এবং আবারো ধন্যবাদ আজকের সময়ের জন্য ।

দর্শক প্রতিক্রিয়া

The Second Encounter

জেরিন চাকমা

একের পর এক প্রমাণ্যচিত্র দেখেই চলেছি। কি মনোমুগ্ধকর এক একটা সৃষ্টি। নির্মাতারা যে প্রত্যেকটা প্রামাণ্যচিত্র কতটা পরিশ্রম ও ভালোবাসার জায়গা থেকে তৈরি করেছেন তার ছোঁয়া যেন স্পষ্ট প্রতীয়মান। তারপরও একজন দর্শক হিসেবে নিজের ভালো লাগার একটা জায়গা কাজ করে। ঠিক সেই জায়গা থেকে একটা প্রামাণ্যচিত্র দেখতে গিয়ে আমি পুরোপুরি থমকে যাই। অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকি এক একটি দৃশ্যে। মনোযোগ দিয়ে শুনতে থাকি এক একটি শব্দ।

The Second Encounter নামের প্রামাণ্যচিত্রটির কথা বলছিলাম। ব্রাজিলের বাসিন্দা VERONIQUE BALLOT প্রামাণ্যচিত্রটি নির্মাণ করেছেন। নির্মাতা তার ক্যামেরায় বলে গেছন কৃষ্ণবর্ণধারী, বনে-জঙ্গলে বসবাসরত কায়াপো (KAYAPO) জনগোষ্ঠী নামে ব্রাজিলে অবস্থানরত এক আদিবাসী জনগোষ্ঠীর কথা। সেখানে নেই কোনো আধুনিকতার ছোঁয়া, নেই কোনো প্রযুক্তি। প্রকৃতির উপর নির্ভর করে চলতে হয় তাদের। শিকারের মাধ্যমেই তাদের জীবনধারণ। আজ থেকে ৬৬ বছর আগে এই আদিবাসী জনগোষ্ঠী প্রথম মুখোমুখি হয় সাদা মানুষের।

Henri Ballot নামে একজন ফটোজার্নালিস্ট তার কাজের সূত্র ধরে এই জনগোষ্ঠীর কাছে পৌঁছান। তাদের অনেক ছবি তার সংগ্রহে থাকে। সেই সূত্র ধরে তার মেয়ে VERONIQUE BALLOT কায়াপো জনগোষ্ঠীদের খোঁজে বের হোন। তিনি বয়োঃবৃদ্ধ কিছু মানুষের খোঁজ পান যারা সে সময়ও ছিলেন যখন তার বাবা সেখানে গিয়েছিল। তাদের সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে এই প্রামাণ্যচিত্রে উঠে আসে তাদের তখনকার জীবনযাপন আর বর্তমান জীবনযাপনের কথা। এই প্রামাণ্যচিত্রটির যে বিষয়টি আমাকে সবচেয়ে বেশি স্পর্শ করেছে তা হলো চলচ্চিত্র নির্মাতার সততা। তিনি সাদা মানুষের (ব্রাজিলের সাধারণ নাগরিক) প্রতিনিধি হয়েও প্রামাণ্যচিত্রে সাদা মানুষের প্রতি কায়াপোদের যে শঙ্কা, যে ভয় তার প্রতিটা কথা ক্যামেরায় ধারণ করার ও উপস্থাপন করার মানসিকতা রেখেছেন।

এই প্রামাণ্যচিত্রটি ফুটে উঠেছে উপনিবেশবাদের প্রভাব, যে উপনিবেশবাদ একটা আদি

জনগোষ্ঠীর মননে সভ্য জাতি নামক চিন্তার অনুপ্রবেশ করায়। যা চারশত বছর আগে ভারতবর্ষ শাসনকালে ব্রিটিশরা করেছিল। যাকে সহজ ভাষায় বলা যায় মস্তিষ্ক দখল। এর মধ্য দিয়ে কায়াপো জনগোষ্ঠীর মধ্যে সৃষ্টি হয় একের পর এক চাহিদা। আর সে চাহিদা পূরণের আকাঙ্খা। সেখান থেকে তাদের যাত্রা শুরু হয় তথাকথিত সভ্য জাতি হিসেবে নিজেদের গড়ে তুলার প্রয়াসে।এর ইতিবাচক দিক হিসেবে তারা যে লাভবান নয় তাও বলা যায় না। তারা চিকিৎসা সেবা পাচ্ছে, নিত্য নতুন যন্ত্রপাতির ব্যবহার শিখেছে, আজ তাদের শিশুরা পড়ালেখা শিখছে। তবে আশংকার বিষয় হলো নিজস্ব সংস্কৃতি থেকে বিচ্যুত হয়ে যাওয়ার ভয় ।একটি জাতিগোষ্ঠী যখন কলোনিয়ালিজমের শিকার হয় তখন সে গোষ্ঠীর মস্তিকে ঠাঁই পেতে থাকে অন্য সংস্কৃতি। সেই অন্য সংস্কৃতি লালন ও পালনের চর্চা থেকে শুরু হয় নিজস্ব স্বকীয়তা হারানোর ভয়। যা এই প্রামাণ্যচিত্রটিতে উঠে আসে। তাছাড়া দেখা যায় তারা কিভাবে ভূমি দখলের শিকার হয়। এমন নানাবিধ শঙ্কার উদয় হয় সেইসব ব্যক্তিদের সাক্ষাৎকারে।

নিজস্ব স্বকীয়তা বজায় রাখার গুরুত্ব কতটুকু তা এই প্রামাণ্যচিত্রে প্রতিয়মান। তাছাড়াও একজন চলচ্চিত্র নির্মাতা হিসেবে নিজের কাজের প্রতি কতটুকু সৎ থাকতে হয় তার একটা দৃষ্টান্ত হতে পারে এই প্রামাণ্যচিত্রটি।

জলগেরিলা ৭১

সানজিদা ইসলাম শ্রাবণী

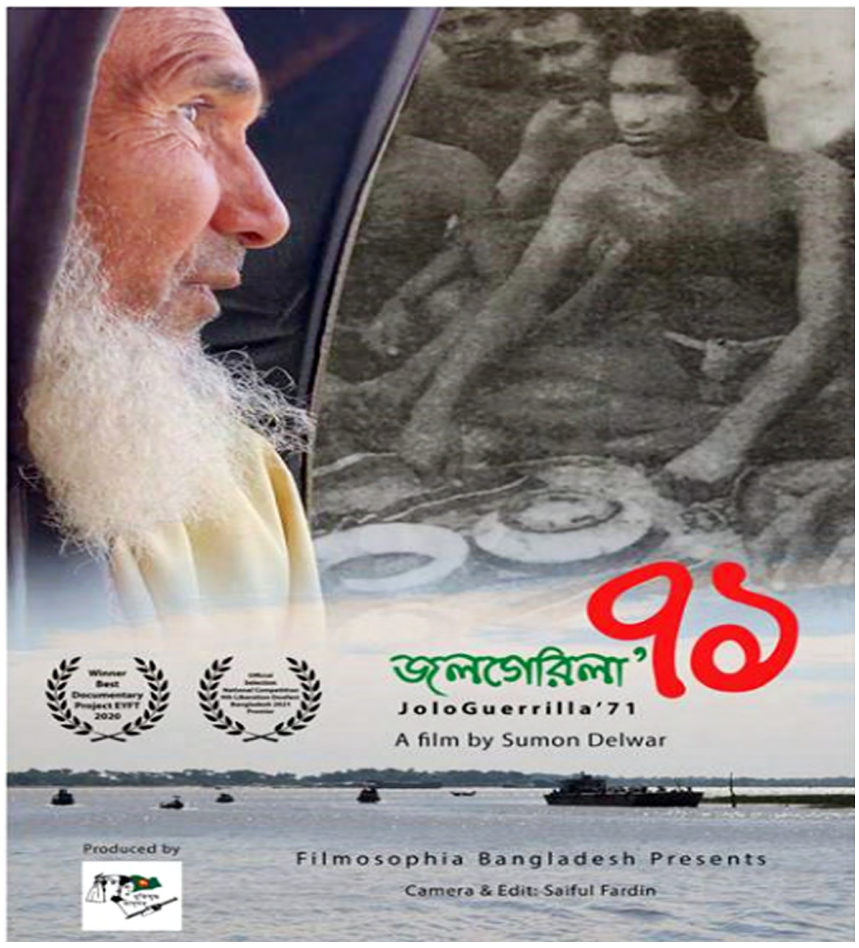

'জলগেরিলা ৭১' এমন একটি প্রামাণ্যচিত্র যেখানে একজন মুক্তিযোদ্ধার অতীতের মুক্তিযুদ্ধ-ইতিহাস চিত্রিত করার পাশাপাশি সময়ের প্রেক্ষিতে অসহায় বয়স্ক দম্পতির একটি মানব গল্প। সেই মুক্তিযোদ্ধা নৌ কমান্ডো হুমায়ুন কবির। তিনি ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে জলে এবং স্থলে অনেকগুলো সম্মুখযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন। কিন্তু তার বর্তমান অবস্থা দুর্বিষহ। হুমায়ূন কবির এবং তার পরিবার প্রতিবেশী দ্বারা বিভিন্নভাবে আক্রান্ত হচ্ছেন এবং প্রতিবেশীরা তাদের জমি দখল করার জন্য তাদের বিরুদ্ধে মামলা করছেন। তার স্ত্রী অসুস্থ এবং তিনি নিজেও হৃদরোগ এবং কিডনি রোগে ভুগছেন। বর্তমান জীবনে বিভিন্ন সমস্যার সমাধান করার যে সংগ্রাম এবং মুক্তিযুদ্ধের সময় ঘটে যাওয়ার গল্প এই প্রামাণ্যচিত্রে প্রকাশ পেয়েছে।

উৎসবের অংশ হিসেবে তৃতীয় দিনের "আর্টিস্ট টক" আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন চলচ্চিত্র নির্মাতা সুমন দেলোয়ার এবং অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন এলিজাবেথ দি কস্তা। প্রথমে চলচ্চিত্র নির্মাতা সুমন দেলোয়ার বলেন, তিনি ২০১৩ সালে 'জলগেরিলা ৭১'-এর কাজ শুরু করেন, প্রথমদিকে তিনি বিভিন্ন নৌ কমান্ড এবং যেসব জায়গায় নৌযুদ্ধ হয়েছিল সেসব সম্পর্কে জেনেছেন। মুলত তিনি এই বিষয় নিয়ে প্রামাণ্যচিত্র নির্মাণ করতে চেয়েছেন। কিন্তু বিভিন্ন জটিলতার কারণে তা নির্মাণ করতে পারেননি। জটিলতা থাকা সত্ত্বেও চলচিত্র নির্মাতা সুমন দেলোয়ারের সাথে মুক্তিযোদ্ধা হুমায়ূন কবিরের যোগাযোগ ছিল। তবে তখনও তিনি হুমায়ূন কবিরের বর্তমান জীবন সম্পর্কে জানতেন না। যখন জানতে পারলেন তখন তিনি তাঁর উপর প্রামাণ্যচিত্র নির্মাণ করার উদ্যোগ নেন। ২০১৯ সালে তিনি তাঁকে নিয়ে কাজ শুরু করেন এবং এর নাম দেন 'জলগেরিলা ৭১'।

তিনি এই প্রামাণ্যচিত্র নির্মাণ করার সময় উপলব্ধি করেন যে, পদক বা সম্মান পাওয়ার পরও অনেক কমান্ডো বা মুক্তিযোদ্ধাদের চাওয়া বা আক্ষেপের অভাব ছিল না, কিন্তু হুমায়ূন কবিরের মধ্যে কোন চাওয়া পাওয়া নেই। এটা নির্মাতেকে খুব আকৃষ্ট করেছে।

নতুন চলচ্চিত্র নির্মাতাদের জন্য তিনি ওয়ার্কশপ করার গুরুত্ব তুলে ধরে বলেন, ওয়ার্কশপ তাদের চলচ্চিত্র নির্মাণের ক্ষেত্রে সহায়ক হবে। যেহেতু তিনি ফিল্ম নিয়ে পড়াশুনা করেননি চলচ্চিত্র নির্মাণ তার কাছে একটা বড় চ্যালেঞ্জ ছিল। তাই তিনি বিভিন্ন ওয়ার্কশপ এবং কোর্সের মাধ্যমে চলচ্চিত্র নিয়ে কাজ শুরু করেছেন। ২০১৭ সালে তার আরেকটি প্রামাণ্যচিত্র ছিল My Sister My Friend। এই ছবিটি তিনি ঢাকা ডকল্যাবে ওয়ার্কশপ এবং উপস্থাপনা করেছিলেন। এই ওয়ার্কশপের মাধ্যমে তার প্রামাণ্যচিত্রের চিন্তা ভাবনার উন্নতি ঘটে। এছাড়াও তিনি আরো আন্তর্জাতিক অনেক ওয়ার্কশপ এবং ফিল্ম উপস্থাপনা করেছেন।

'জলগেরিলা-৭১' নির্মাতা মনে করেন হুমায়ুন কবির ছাড়া আরও অনেক মুক্তিযোদ্ধা আছে যারা আজ এই সমাজে অবহেলিত, অত্যাচারিত হচ্ছে যেখানে তাঁদের সম্মান পাওয়ার কথা ছিল। তাদের কথা আজ অনেকের অজানা সেই অজানাকে কিভাবে মানুষের কাছে আনা যায় এবং কিভাবে তাদের পাশে থাকা যায় এ বিষয়টিও উঠে আসে।

জেয়াদ আল মালুম স্মরণে

মোশাররাত মেহ্বুবা আবৃত্তি

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের শুভার্থী অ্যাডভোকেট জেয়াদ আল মালুম ছিলেন একজন মুক্তিযোদ্ধা এবং একই সাথে বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের সিনিয়র প্রসিকিউটর। মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের কাজে এ বীর মুক্তিযোদ্ধার অবদান অপরিসীম। গত ১২ মার্চ ২০২১ মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর আয়োজিত গ্লোবাল ভার্চুয়াল কনফারেন্সে তিনি-৭১-এর গণহত্যার আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি এবং আন্তর্জাতিক অপরাধট্রাইব্যুনালের ভূমিকা শিরোনামে তাঁর একটি গবেষণাপত্র উপস্থাপন করেন।

প্রথমেই মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন সময়ের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ব্যক্ত করেন তিনি। পরবর্তীতে একাত্তরের নৃশংসতা এবং গণহত্যার কালো ইতিহাস তুলে ধরেন। একইসঙ্গে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল আইন ১৯৭৩ এবং জেনোসাইড কনভেনশন ১৯৪৮ অনুযায়ী গণহত্যা এবং যুদ্ধাপরাধ সংজ্ঞায়িত করেন। গণহত্যা ও যুদ্ধাপরাধের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল আইন ১৯৭৩-এর ভূমিকা বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি এ বিধান তৈরি ও প্রয়োগের ইতিহাস তুলে ধরেন। তিনি জেনেভা কনভেনশন ১৯৪৮ এবং জেনোসাইড কনভেনশন ১৯৪৮-এর সংশ্লিষ্টতাও ব্যাখ্যা করেন এখানে। তিনি বলেন স্বাধীনতার পর কীভাবে এবং কেন এই ট্রাইব্যুনাল গঠিত হয়। এখন পর্যন্ত কতটা দৃঢ়তার সাথে এর কার্যক্রম চলছে তার বিবরণে তিনি জানান যে, ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক যুদ্ধাপরাধ বিষয়ে বিয়াল্লিশটি মামলার বিচার নিষ্পত্তি হয়েছে। এমন কি চলমান ছত্রিশটি মামলায় অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে কতটা নৃসংশতার অভিযোগ রয়েছে এবং প্রোসিকিউশন তা প্রমাণে কতটা কী করছেন, কোন আইনের সহায়তা নিচ্ছেন সে বিষয়েও তিনি বিস্তারিত আলোচনা করেন। আন্তর্জাতিক স্বীকৃতির ব্যাপারটি বোঝাতে তিনি আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের অত্যন্ত প্রসিদ্ধ একটি মামলার উল্লেখ করেন। মামলাটি দক্ষিণ এশিয়ার অন্যতম খ্যাতিমান ব্যক্তি রণদা প্রসাদ সাহার অপহরণ এবং তাঁর প্রতি করা অত্যাচার বিষয়ক। স্থানীয় ডাকাতদলের সাথে মিলে আল-বদর নেতা মাহাবুব কীভাবে রণদা প্রসাদ সাহার প্রতি অত্যাচার করেন তার বর্ণনা তিনি এখানে দেন ১৯৭৩-এর আইন অনুযায়ী। এ মামলার ওপর ট্রাইব্যুনাল পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী ও তাদের সহযোগী জামাত-ই-ইসলাম, আল-বদর, আল-শামস বাহিনীর অত্যাচার, নিপীড়ন, নৃশংসতা এবং গণহত্যাকে বাংলাদেশের স্বাধীনতার অবিস্মৃত স্মৃতি বলে ঘোষণা করার মাধ্যমে কীভাবে গণহত্যা প্রতিরোধে সক্রিয় ভূমিকা রেখেছে তার ব্যাখ্যাও তিনি এই গবেষণার মাধ্যমে আমাদের জানান। পরিশেষে মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন নৃশংসতাকে গণহত্যা হিসেবে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি দানে বাংলাদেশ সরকার ও তার পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় যেসব উপায়ে আন্তর্জাতিক সংস্থা এবং সম্প্রদায়ের দৃষ্টি আকর্ষণ সম্ভব তা নিয়ে তিনি আলোচনার মাধ্যমে নিজ বক্তব্য সমাপ্ত করেন।

সদ্য প্রয়াত এ বিজ্ঞ আইনজীবী বীর মুক্তিযোদ্ধা জেয়াদ আল মালুম-এর এ গবেষণাপত্র তরুণ আইনজীবীসহ মুক্তিযুদ্ধ ও গণহত্যা বিষয়ক সকল গবেষকদের জন্যে পাথেয় হয়ে থাকবে। আমরা শ্রদ্ধাচিত্তে তাঁকে স্মরণ করছি।

ভিডিও লিংক - https://youtu.be/Sp06KidWqZM

মুকুন্দ কুমার রায়

সাতক্ষীরা জেলার তালা উপজেলার খলিল নগর ইউনিয়ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সহকারি শিক্ষক ও তালা উপজেলার শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক এবং মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের নেটওয়ার্ক শিক্ষক বাবু মুকুন্দ কুমার রায় বিগত ১৭ ডিসেম্বর তালা উপজেলা সদরে যাবার পথে সড়ক দুর্ঘটনায় গুরুত্বর আহত হয়ে খুলনা মেডিকেল কলেজে চিকিৎসা নেন। খুলনায় তিনদিন অবস্থানের পর উন্নত চিকিৎসার জন্য ঢাকায় পঙ্গু হাসপাতালে নিয়ে আসা হয় এবং চিকিৎসাধীন অবস্থায় বাবু মুকুন্দ কুমার রায় ১৪ জানুয়ারি ২০২১ পরলোক গমন করেন। বাবু মুকুন্দ কুমার রায়ের অকাল প্রয়াণে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর পরিবার গভীরভাবে শোকাহত। পরোপোকারী এই বন্ধু নেটওয়ার্ক শিক্ষক ২০১৯-এ ভ্রাম্যমাণ মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর সাতক্ষীরা জেলায় পরিক্রমণ সময়ে সার্বিকভাবে সহযোগিতা করেছেন।

জাদুঘরের আর্কাইভ থেকে

মুক্তিযুদ্ধকালে ‘মুজিবনগর’ সরকারের উদ্যোগে প্রকাশিত

বাংলাদেশ ডাকটিকিট

লন্ডন, জুলাই, ১৯৭১

মুক্তিযুদ্ধকালে প্রকাশিত প্রথম ডাকটিকিটসহ মুজিবনগর সরকারের বিশেষ দূত বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী, ব্রিটিশ পার্লামেন্ট সদস্য জন স্টোনহাউজ ও গ্রাফিক্স শিল্পী বিমান মল্লিক। ২৬ জুলাই ১৯৭১ হাউজ অব কমন্সের কমিটি রুমে ডাকটিকিটের প্রিভিউ অনুষ্ঠিত হয়। ২৯ জুলাই আনুষ্ঠানিকভাবে যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, ভারত, অস্ট্রেলিয়া ও দূরপ্রাচ্যে ৮টি ডাকটিকিটের ‘সেট’ ও ‘ফার্স্ট ডে কভার’ প্রকাশ করা হয়।

বাংলাদেশের প্রথম ডাকটিকিটের নকশা অঙ্কনকারী গ্রাফিক্স শিল্পী বিমান মল্লিক। লণ্ডনে জুলাই ১৯৭১ সালে তাঁর নকশাকৃত ডাকটিকিট ও ‘ফার্স্ট ডে কভার’।

দাতা: আবদুল মতিন

শ্র দ্ধা জ্ঞ লি

ফজল-এ-খোদা

৯ মার্চ ১৯৪১ - ৪ জুলাই ২০২১

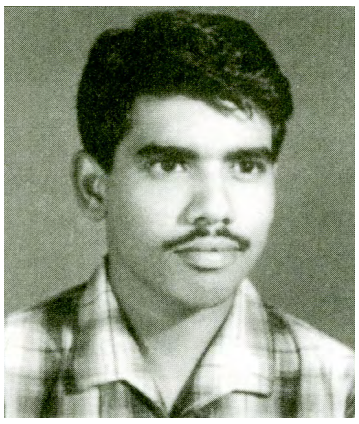

ফজল-এ-খোদা মুক্তিসংগ্রামে শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে রচনা করেন অমর সঙ্গীত ‘সালাম, সালাম, হাজার সালাম’। এই গান তিনি ২৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯ লিখেছিলেন ডায়েরিতে। ১৯৭১-এর মার্চে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান শিল্পী আব্দুল জব্বারকে শহীদদের নিয়ে একটি গান তৈরি করতে বলেন। তখন আব্দুল জব্বার এতে সুরারোপ করেন এবং বঙ্গবন্ধুকে গেয়ে শোনান। যুদ্ধ শুরু হলে এই গান অর্জন করে আলাদা তাৎপর্য, ছুঁয়ে যায় সবার হৃদয়।

ফজল-এ-খোদার গানের খাতা সংরক্ষিত আছে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরে। তাঁর প্রয়াণে আমরা গভীরভাবে শোকাহত।

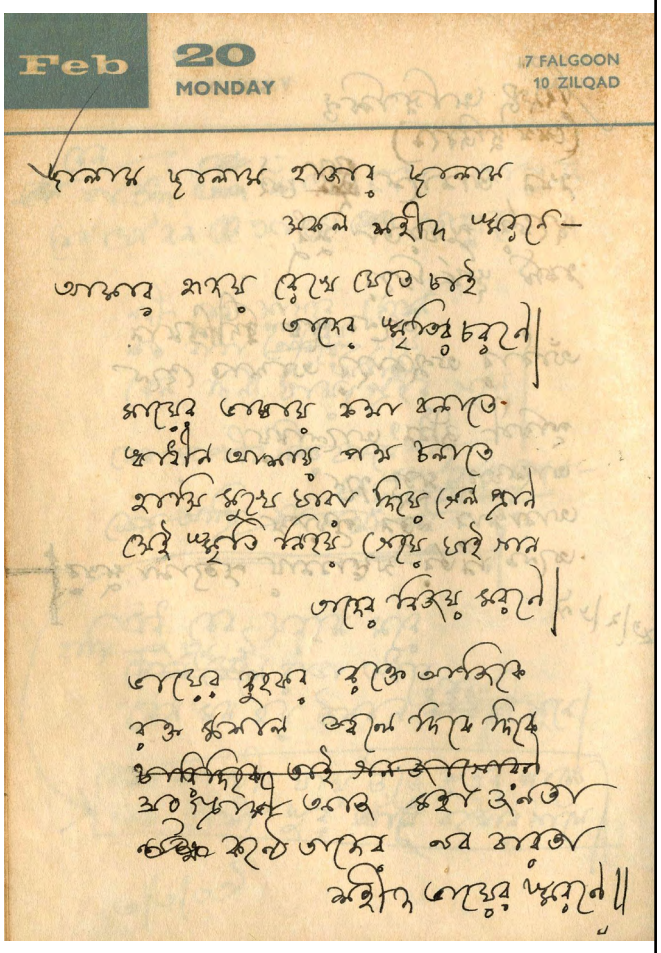

২০২০-২০২১ অর্থ বছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA) স্বাক্ষর

গত ৩০ জুন ২০২১ মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর এবং মন্ত্রণালয়ের মধ্যে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি ২০২১-২০২২ স্বাক্ষরিত হয়। এতে জাদুঘরের পক্ষে ট্রাস্টি ও সদস্য সচিব সারা যাকের এবং মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের পক্ষে সচিব জনাব খাজা মিয়া স্বাক্ষর করেন। স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মন্ত্রণালয়ের অধিদপ্তর/সংস্থার প্রধানগণ ও ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ।

লিবারেশন ডকফেস্ট

১ম পৃষ্ঠার পর

সময় ব্যয় করে এই দুরূহ কাজটি সম্ভব করেছেন। প্রাথমিক বাছাই শেষে শুরু হয় প্রতিযোগিতা বিভাগের জন্য চলচ্চিত্র নির্বাচন, যার জন্য প্রতিটি ছবি উৎসব পরিচালক তারেক আহমেদ এবং আমাকে পুনরায় দেখতে হয়েছে। এবারের ফেস্টিভ্যালে জাতীয় প্রতিযোগিতা বিভাগে ৫টি এবং আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতা বিভাগে ৯টি ছবিকে আমরা নির্বাচন করি। সেরা ছবি নির্ধারণের মিটিংয়ে জুরিরা বেশ হিমশিম খেয়েছেন এবং আমাদের সিলেকশন এর প্রশংসা করেছেন।

এবারের ফেস্টিভ্যালটি হাইব্রিড হবার কথা ছিলো। কিন্তু করোনা মহামারির দ্বিতীয় ঢেউয়ের কারনে আমাদের উৎসবের তারিখ পরিবর্তন এবং পুরোপুরি অনলাইনে করার সিদ্ধান্ত নিতে হয়। যেহেতু ফেস্টিভ্যালের সব প্রস্তুতি ছিল এবং নির্মাতাদের সবাইকে জানানো হয়েছিল হঠাৎ নেয়া এই সিদ্ধান্তে আমাদের যোগাযোগের কাজটি দু'বার করতে হয় এবং পুনরায় পুরো প্রোগ্রাম নতুন করে শিডিউল করতে হয়।

নিয়মিত চলচ্চিত্র প্রদর্শনের পাশাপাশি এবারের অনলাইন ফেস্টিভ্যাল ছিল নানা প্রোগ্রামমুখর। পাঁচ দিনের এই উৎসবে আমাদের ছিলো ৪টি গুরুত্বপূর্ণ এবং প্রাণবন্ত প্যানেল ডিসকাশন। ছিলো দেশি ও বিদেশি চলচ্চিত্র নির্মাতাদের নিয়ে ৮টি আর্টিস্ট টক।

আমার কাছে ফেস্টিভ্যালের সবচেয়ে আকর্ষণীয় দিক ছিল ইয়ুথ জুরিদের সেরা ছবি নির্বাচনের মিটিং। তরুণদের নানা মাত্রার বিশ্লেষণ সত্যিই অতুলনীয়। প্রায় দু'ঘণ্টা লেগেছে সেরা ছবির বিষয়ে সিদ্ধান্তে আসতে।

এবারের উৎসবে ১১২৮৯ বার ছবি দেখেন দর্শকরা। অনলাইনের আশীর্বাদে সারাদেশ থেকেই দর্শক ছিলো এবারের আয়োজনে। আমাদের সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছিলো লাখো মানুষের সম্পৃক্ততা, যা বাংলাদেশে প্রামাণ্যচিত্রের দর্শক তৈরিতে এটি বিশাল ভূমিকা রেখেছে। ফিজিক্যাল উৎসব যখন হতো উৎসবের সব কর্মীরা দু'বার মিটিং করতাম, একবার সকালে শো শুরু হবার আগে দায়িত্ব ভাগ করার জন্যে আবার সন্ধ্যায় সব শো শেষ করে। ভার্চুয়াল উৎসবেও আমরা দু'বার জুম মিটিং করি, কারো ভিডিও অন থাকে, কারো শুধুই অডিও। তবে এর ফলে সারাদেশ থেকেই মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের সাথে সম্পৃক্ত হবার সুযোগ পায় তরুণরা। এমন তাৎপর্যপূর্ণ ও সফল একটি উৎসব করার মূল শক্তি যোগায় আমাদের অগ্রজদের নির্দেশনা, তারুণ্য আর বৈষম্যহীন একটি পৃথিবী গড়ে তোলার জন্য সিনেমাকে মাধ্যম হিসেবে নেওয়া একদল মানুষের প্রচেষ্টা। এই চলচ্চিত্র উৎসবের কিছু ঘাটতি থাকতেই পারে তবে ঘাটতি নেই সবার আন্তরিকতা আর ভালোবাসায়। এটি সকলের ভালোবাসার চলচ্চিত্র উৎসব।

বিশ্ব শরণার্থী দিবস-২০২১

১ম পৃষ্ঠার পর

সরকার রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর উপর সংগঠিত নৃশংসতার পর থেকেই সিএসজিজে নিজস্ব কর্মকাণ্ডের মধ্যদিয়ে তাদের পাশে দাড়িয়েছে। এ পর্যায়ে সিএসজিজের কার্যক্রম সহকারী হাসান মাহমুদ অয়ন এযাবৎকাল সিএসজিজে কর্তৃক রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর উদ্দেশ্যে সংগঠিত নানা কর্মকাণ্ডের তথ্যসম্বলিত উপস্থাপনা তুলে ধরেন।

এশিয়া জাস্টিস এন্ড রাইটস (এজেএআর) এর কার্যক্রম সহকারী নাসরিন আক্তার, তার বক্তব্যের শুরুতে এজেএআর-এর সংক্ষিপ্ত পরিচয় তুলে ধরেন। রোহিঙ্গা শরণার্থী শিবিরে সরাসরি কাজ করার দরুন নাসরিন তার ব্যক্তিগত ও পেশাগত অভিজ্ঞতার আলোকে রোহিঙ্গা শরণার্থী শিবিরে তাদের কর্মসূচির বিস্তারিত বিবরণ তুলে ধরেন তার উপস্থাপনায়।

অনুষ্ঠানের পরবর্তী পর্যায়ে একাত্তরের শরণার্থী শিবিরে কর্মরত অক্সফাম কর্মকর্তা এবং বাংলাদেশের বিদেশী বন্ধু হিসেবে খ্যাত জুলিয়ান ফ্রান্সিসের শরণার্থী বিষয়ক লেখা পড়ে শোনান জাদুঘরের স্বেচ্ছাসেবী হুমায়রা বিনতে ফারুক। জুলিয়ান তার লেখনীতে একাত্তরের শরণার্থী শিবির এবং বর্তমানে রোহিঙ্গা শরণার্থী শিবির উভয় চিত্রই সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তোলেন।

ঘণ্টাব্যাপী বিশেষ এই অনুষ্ঠানে সমাপনী বক্তব্য রাখেন মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের সম্মানিত ট্রাস্টি এবং সিএসজিজে পরিচালক মফিদুল হক। এ সময় তিনি বিশ্বের সকল শরণার্থী যেন তাদের স্ব স্ব জন্মভূমিতে স্ব-সম্মানে ফিরে যেতে পারে এই আশাবাদ ব্যাক্ত করে সকলকে একসাথে কাজ করার প্রতিশ্রুতি ব্যাক্ত করে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

ভিডিও লিংক- https://m.facebook.com/liberationwarmuseum.official/videos/154444466733455/

সুফিয়া কামাল জাহানারা ইমাম শ্রদ্ধাঞ্জলি

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের নিয়মিত অনুষ্ঠান হিসেবে ২৬ জুন ২০২১ আয়োজিত হলো জননী সাহসিকা সুফিয়া কামাল ও শহীদ জননী জাহানারা ইমাম শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন। ট্রাস্টি সারা যাকেরের পরিচালনায় এই আয়োজনে সুফিয়া কামালের জীবনের নানা দিক তুলে ধরেন তাঁর কন্যা সুলতানা কামাল। জীবনের সূচনা লগ্নে মহাত্মা গান্ধী, রোকেয়া, বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সাহচর্য ধন্য সুফিয়া কামাল তাঁর কবি সত্তার পাশাপাশি জাতীয় পর্যায়ে নারীর অধিকার আন্দোলনে, সাংস্কৃতিক আন্দোলনে এবং দেশের প্রতিটি সংকটকালে নেতৃত্বে এসেছেন তাঁর দৃঢ়তা, অঙ্গীকার ও সাহস নিয়ে। সকলের জন্য হয়ে উঠেছেন নির্ভরতার জায়গা, এমনকি ৯০ এর দশকে স্বাধীনতা বিরোধীদের বিচারের দাবীতে ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি গঠনের সময়ে তাঁকে নেতৃত্ব নেবার আহ্বান জানানো হলে বার্ধ্যকের কারণে তিনি জাহানারা ইমামকে সে দায়িত্ব দেন এবং নিজে উৎসাহ দেবার জন্য সাথে ছিলেন। ক্যান্সার আক্রান্ত শহীদ জননী জাহানারা ইমাম সে দায়িত্ব আমৃত্যু পালন করে গেছেন। জাহানারা ইমামের 'ক্যান্সারের সাথে বসবাস' গ্রন্থ থেকে পাঠ করেন বুশরা আহমেদ তিথী। সবশেষে কাওসার আহমেদ পরিচালিত গণতাদালত প্রামাণ্যচিত্রটি প্রদর্শিত হয়।

লিবারেশন ডকফেস্ট

ইয়ুথ জুরি হিসেবে আমার অনুভূতি

লিবারেশন ডকফেস্ট-এর মতো এত বড় একটি প্রামাণ্যচিত্র উৎসবে ইয়ুথ জুরি হিসেবে দায়িত্ব পালন একই সাথে যেমন ছিলো অনেক আনন্দের তেমনি ছিলো অনেক অভিজ্ঞতাবহুল একটি জার্নি। ইয়ুথ জুরি হওয়ার সুবাদে দেখেছিলাম এই উৎসবের অনেকগুলো চলচ্চিত্র। যা হয়তো সচরাচর দেখার সুযোগ হয় না কিংবা উৎসব ব্যাতিত দেখতেও পাওয়া যায় না। উৎসবে যে শুধু চলচ্চিত্রগুলো দেখতে পেয়েছি তা নয়, চলচ্চিত্রগুলোর আর্টিস্ট টক সেশনে অংশগ্রহণ করে শুনেছি, জেনেছি নির্মাণের পেছনের গল্প, প্রতিবন্ধকতাসমূহ, নির্মাতার ব্যাক্তিগত দর্শন এবং প্রামাণ্যচিত্রের বিষয়ের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট। তা একটি চলচ্চিত্র বা প্রামাণ্যচিত্রকে আরো ভালোভাবে দেখতে, বুঝতে ও অনুভব করতে যেমন সাহায্য করে তেমনি চলচ্চিত্র নির্মাণের ব্যাপারেও আমাদের অনুপ্রাণিত করে। নির্মাতাদের সাথে প্রশ্নোত্তর পর্বে প্রশ্ন করে জেনে নিতে পেরেছি চলচ্চিত্রগুলো দেখার সময়ে মনের মধ্যে উঁকি দেয়া জিজ্ঞাসার উত্তর, মিটিয়ে নিয়েছি কৌতূহলগুলো। এছাড়াও ইয়ুথ জুরি টিমে অন্যান্য যারা ছিলেন প্রত্যেকেই হয়তো কোনো চলচ্চিত্র শিক্ষার্থী বা চলচ্চিত্রপ্রেমী। তাই তাদের সাথে চলচ্চিত্র দেখা কিংবা চলচ্চিত্র নিয়ে আলোচনার সেশনগুলোও ছিলো দারুণ এনার্জিটিক। সেখানে নিজের মতামত শেয়ারের পাশাপাশি জেনেছি তাদের পার্সপেক্টিভে ও তাদের পয়েন্ট অব ভিউ থেকে চলচ্চিত্রটি কেমন ছিলো। তরুণ চলচ্চিত্র নির্মাতা ও ফিল্ম স্টুডেন্টদের নিয়ে আয়োজিত সেমিনারে অংশগ্রহণের মাধ্যমে একজন চলচ্চিত্র শিক্ষার্থী হিসেবে ভবিষ্যতে চলচ্চিত্র নির্মাণকালে আমাদের কি কি প্রতিবন্ধকতা আসতে পারে এবং সেটা কিভাবে মোকাবিলা করতে হবে তার সম্পর্কে ধারণা পেয়েছি, জানতে পেরেছি বই পুস্তকের পড়াশোনা শেষে মাঠে কাজ করতে গেলে কি সমস্যার সম্মুখীন হতে পারি। অন্যান্য সেমিনার ও সেশনগুলোতে বাংলাদেশের যেসব নির্মাতা ও সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্বগণ ছিলেন তাদের আলোচনা থেকে বাংলাদেশে প্রামাণ্যচিত্রের বর্তমান অবস্থান এবং ভবিষ্যৎ প্রয়োজনীয়তা ও পরিকল্পনা নিয়ে জানতে পেরেছি। সব মিলিয়ে ইয়ুথ জুরি থাকাকালীন উৎসবের এই সময়টা ছিলো দারুণ উপভোগ্য এবং শিক্ষণীয়। আশা করি আমার এই অর্জিত জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার আলোকে ভবিষ্যতে আরো বড় কোনো উৎসবেও গুরত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে সক্ষম হবো। পরিশেষে এই আয়োজনের সাথে জড়িত সকলকে ধন্যবাদ আমাকে এমন একটি সুযোগ করে দেয়ার জন্য।

আদনান মাহমুদ সৈকত

ইয়ুথ জুরির কাজে আমার অর্জন

Liberation Docfest-এর মত এত বড় স্বনামধন্য প্রামাণ্যচিত্র উৎসবের অংশ হতে পারাটাই ছিলো আমার জন্য দারুণ এক প্রাপ্তি। সেখানে একজন ইয়থ জুরি হিসেবে দায়িত্ব পালন করাটা একই সাথে যেমন সম্মানের, তেমনি দায়িত্বেরও বটে। ইয়ুথ জুরি হওয়ার সুবাদে আমি অনেক বেশি প্রামাণ্যচিত্র দেখার সুযোগ পেয়েছি। উৎসবের প্রতিদিন দুটি প্রামাণ্যচিত্রের পরিচালকের সাথে আলাপ এবং সন্ধ্যায় একটি চলচ্চিত্র বিষয়ক সেশনের মাধ্যমে প্রামাণ্যচিত্র সম্পর্কে পরিচালকদের সরাসরি বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর, পরিচালকের নিজের কথাগুলো জানতে পেরেছি। সন্ধ্যার সেশনগুলো যেখানে সংযুক্ত থ াকতেন স্বনামধন্য চলচ্চিত্র ও প্রামাণ্যচিত্রের কারিগররা, তাতে যুক্ত হয়ে প্রামাণ্যচিত্র নির্মাণ, প্রতিবন্ধকতা, সফলতা ব্যর্থতা, কারিগরি কাজ, পরিশ্রম ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো জেনেছি ও শিখেছি। ইয়ুথ জুরির প্রত্যেক সদস্যই চলচ্চিত্রপ্রেমী হওয়ায় তাদের কাছ থেকেও বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে জানতে পেরেছি। এছাড়া ভলান্টিয়ার মিটিং, প্রুথ জুরিদের প্রামাণ্যচিত্র নিয়ে আলোচনা, প্রামাণ্যচিত্রের রেটিং, শাওন ভাই, মাশা আপু, নিলয় ভাই, সুস্মিতা আপু, বিন্তি আপু, মৌটুসি আপুসহ দলের সকলের সাথে হৃদ্যতাপূর্ণ মিথস্ক্রিয়া; কিছু নতুন মানুষের সাথে পরিচয়, আমার এই উৎসবের পথচলাকে আরও সুন্দর করেছে। পরিশেষে বলতে চাই, Liberation Docfest-এর সাথে কাজ করাটা ছিলো আমার জন্য একটি দারুণ অভিজ্ঞতালব্ধ ও শিক্ষণীয় অভিজ্ঞতা।

রাজিব শাহরিয়ার সৈকত

ইয়ুথ জুরি

৩০ মে একটা ইমেইল পাওয়ার মাধ্যমে নিশ্চিত হলাম আমি ৯ম লিবারেশন ডকফেস্টের একজন ভলন্টিয়ার হিসেবে কাজ করার সুযোগ পাচ্ছি। যেটা নিঃসন্দেহে আমার জন্য অনেক খুশির সংবাদ ছিলো। যার কারণ ডকুমেন্টারি অর্থাৎ, প্রামাণ্যচিত্র সম্পর্কে আরো বিশদভাবে জানার আগ্রহ। বলে রাখা ভালো, প্রামাণ্যচিত্রের প্রতি কখনো আমার তেমন একটা আকর্ষণ ছিলো না। কেমন যেন ধৈর্য হারিয়ে ফেলতাম। একজন চলচ্চিত্রপ্রেমি হিসেবে এ অভ্যাসটাকে বাদ দেওয়ার প্রয়োজনার্থে আমার এ ডকফেস্টে অংশগ্রহণ করার প্রয়াস।

যখন জানতে পারি এবারের ফেস্ট হবে অনলাইনে তখন একটু মন খারাপ হলো। মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরে গিয়ে সশরীরে উপস্থিত থেকে সকলের সাথে মিলেমিশে কাজ করার মাঝে যে আনন্দ সেটা বোধ হয় হারালাম। অবশ্য এই করোনাকালীন পরিস্থিতিতে এমন সিদ্ধান্ত নিঃসন্দেহে প্রাসঙ্গিক। তাই আর এই ব্যাপারটা নিয়ে খুব একটা ভাবলাম না।

ফেস্ট শুরু হলো, নিয়মিত প্রত্যেকটা জুম মিটিংয়ে অংশগ্রহণ করতে থাকলাম। আমাদের প্রতিদিন কিছু প্রামাণ্যচিত্র দেখতে বলা হলো এবং এদের বিভিন্ন গ্রেডে মার্কিং করতে বলা হলো। এ যেন এক বিশাল বিপত্তি। হ্যাঁ, ইয়ুথ জুরির কথা বলছি। আমরা ভলান্টিয়রা ইয়ুথ জুরি হিসেবেও দায়িত্ব পালন করবো। আমাদের মার্কিংয়ের উপর নির্ভর করে জাতীয় আর আন্তর্জাতিক দু'টি বিভাগে প্রামাণ্যচিত্রকে পুরষ্কৃত করা হবে। দায়বদ্ধতার জায়গা থেকে আমার দায়িত্ব সব প্রামাণ্যচিত্রগুলো ভালোমতো দেখা আর মার্কিং করা। আমার উপর অর্পিত দায়িত্ব আমাকে একটা শিক্ষা দিয়েছে, প্রামাণ্যচিত্রর গুরুত্ব যে কতটুকু এবং প্রামাণ্যচিত্র কিভাবে একজন দর্শক হিসেবে আপনাকে তার গল্পের সাথে পুরোপুরি জুড়ে দেওয়ার সক্ষমতা রাখে এই ব্যাপারটা আমি অনুধাবন করতে পেরেছি।

পুরো ফেস্ট জুড়ে আমার জন্য মূল আকর্ষণ ছিল আর্টিস্ট টক। আমরা সুযোগ পেয়েছিলাম চলচ্চিত্র নির্মাতাদের সাথে কথা বলার, তাদের নির্মিত প্রামাণ্যচিত্র নিয়ে মনে উদয় হওয়া সকল প্রশ্নের উত্তর খোঁজার। ফেস্ট কতৃপক্ষের এই উদ্যোগটির জন্য তাদের কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। দেখতে দেখতে কখন যে পাচঁটা দিন শেষ হয়ে গেল বুঝতেই পারিনি। ঘরবন্দী এই সময়ে থেকে মস্তিষ্ক যখন প্রায় অচল ঠিক তখনই ডকফেস্টের মতো একটা আয়োজনের পথ চলার সারথী হতে পেরে নিজেকে ধন্য মনে করছি। আমার জীবনে এক স্মৃতিময় অধ্যায় হয়ে থাকবে এই পাঁচটি দিন।

জেরিন চাকমা

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের পক্ষে **সারা যাকের**, ট্রাস্টি ও সদস্য সচিব, এফ-১১/এ-বি, সিভিক সেন্টর, আগারগাঁও, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭ থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক : ড. রেজিনা বেগম
গ্রাফিক্স ডিজাইন : এম আর ইসলাম। ফোন : ৮৮ ০২ ৯১৪২৭৮১-৩, ই-মেইল : mukti.jadughar@gmail.com
Web : www.liberationwarmuseumbd.org, Facebook : facebook.com/liberationwarmuseum.official